সাধু সন্তের জীবনে
আলৌকিক রহস্য
স্বামী দিব্যানন্দ
bengaliboi.com

ধু সন্তের জীবনে অলৌকিক রহস্য

॥ প্রথম খণ্ড ॥

স্বামী দিব্যানন্দ

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :   শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বিষয় সূচী

স্বামী দিব্যানন্দের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

পরলোক ও প্রেততত্ত্ব

তন্ত্র রহস্য

শ্রীভগবানদাস বাবাজী

অম্বিকা কালনায় নিজের ভজন-কুটীরে ভগবানদাস বাবাজী মালা হাতে ঠাকুরের নামজপ করছেন, চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত। দেখে বুঝতে কারো বাকী থাকে না যে ধ্যানাবেশে বাবাজীর কোন বাহ্যজ্ঞান নেই।

এই সময় বাবাজীর ভজন-কুটীরে এক বিশিষ্ট দর্শনার্থী প্রবেশ করলেন। ইনি যে সে ব্যক্তি ন'ন, ঐ অঞ্চলের মহাপ্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী বর্ধমানের মহারাজা। তিনি আসবার সঙ্গে সঙ্গে এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন বাবাজী, হঠাৎ হাতের মালাটি আসনের উপর নামিয়ে রেখে চীৎকার করে উঠলেন, ওরে মার মার, তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে।

বাবাজীর কাণ্ড দেখে মহারাজ তো একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। মহাপুরুষকে প্রণাম করতে এসে এ কি বিপত্তি!—ভাবলেন বিষয়ী লোকের সংস্পর্শ এ: 'তে চা'ন বলেই হয়ত বাবাজীর এ রোষ।

ঐ একবার বিস্ফোরণের পরই কিন্তু ভগবানদাস একেবারে চুপ। নয়ন দুটি ঠিক আগের মতই নিমীলিত, দেহ নিস্পন্দ, মুখে ইষ্টধ্যানের প্রশান্তি। বাহ্যজ্ঞানহীন বৈষ্ণব মহাপুরুষের দিকে তাকিয়ে বর্ধমান-রাজ ভাবতে লাগলেন, বাবাজীর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে তাঁর আজকের এই ক্রোধের কারণ জেনে নিয়ে তিনি এখান থেকে উঠবেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বাবাজী হাতের মালাগাছাটি রেখে সামনে তাকিয়ে মহারাজকে দেখেই ব্যগ্র হয়ে মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কখন আসা হ'ল, বাবা? ঠাকুর আনন্দে রেখেছেন তো? ঠাকুরের প্রসাদ কি এখানে পেয়েছেন?

বাবাজীর কথা শুনে মহারাজের তো বি ...র অন্ত রইল না।

যিনি কিছুক্ষণ আগে তীব্র চীৎকারে তাঁকে তাড়াতে উদ্যত হয়েছিলেন তাঁর মুখেই আবার এ কি মধুর সম্ভাষণ?

যাই হ'ক সাহস সঞ্চয় করে মহারাজ এবার বাবাজীকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বাবা, আমি ভজন কুটীরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি অমন মারমুখী হয়ে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন কেন? আমি বিষয়ী হতে পারি, কিন্তু নামব্রহ্মের দর্শনার্থী তো বটে! এমন কটু কথা আমায় কেন বললেন?

সে কি, বাবা। সর্বত্রাভ্যাগতো গুরু—অভ্যাগত মাত্রেই যে বৈষ্ণবের পূজ্য, পরম আরাধ্য। তাকে কটু কথা বলা মানে তো ভগবানকে অসম্মান করা। আপনাকে কখন আমি কটু কথা বললাম?

আজ্ঞে, আমি আপনার চরণ-দর্শনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনি মার, মার, তাড়িয়ে দে বলে আমার উপর রোষ দেখালেন।

বাবাজী মহারাজ জিভ কামড় খেয়ে বললেন, ছি ছি, একি আমি করতে পারি! না, বাবা, আপনি মনে কোন দুঃখ রাখবেন না, আপনাকে উদ্দেশ করে আমি ওসব কিছু বলিনি। আপনি কখন এসেছেন তা আমি এ স্থূল চোখে দেখিওনি। সে সময় বৃন্দাবন ধামে গোবিন্দ মন্দিরের তুলসী-মঞ্চে উঠে একটা ছাগল তুলসী পাতাগুলি খেয়ে ফেলছিল। এতে প্রভুর সেবার বিঘ্ন হবে, তাই ছাগলটাকে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। ঐ ছাগলটার উদ্দেশ্যেই আমার ঐ গালিগালাজ।

শুনে বর্ধমানরাজের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না: কালনার ভজনকুটীরে থেকে ইনি কি করে বৃন্দাবনধামের গোবিন্দ-মন্দিরের তুলসীমঞ্চ থেকে ছাগল তাড়াতে পারেন তা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠলেন না।

পকেট-ঘড়িটি বের করে সময়টা একবার দেখে নিলেন, তারপর বাবাজী মশায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করে প্রণামান্তে বিদায় নিলেন মহারাজ।

বর্ধমানরাজ তখন ভাবছেন—গোবিন্দ মন্দিরে এই সময় এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা সেটা না জানলে তাঁর চলবে না। সেইদিনই বৃন্দাবনের তাঁর এক বন্ধুর কাছে তার করে খবরটা জানতে চাইলেন। উত্তরে জানা গেল তাঁর উল্লেখিত দিনের উল্লেখিত সময়ে গোবিন্দ-মন্দিরের তুলসীমঞ্চের চারা তুলসীগাছটি ঠিকই ছাগলে খাচ্ছিল, কালনার ভগবানদাস বাবাজী সেই সময় মন্দির প্রাঙ্গণে এসে লাঠি হাতে চীৎকার করতে করতে ছাগলটিকে তাড়িয়ে দেন।

স্বামী নিগমানন্দ

সন্ন্যাসজীবন এমন কি আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করবার আগেই স্বামী নিগমানন্দের অলৌকিক দর্শন ঘটে। নাম তখন তাঁর নলিনী-কান্ত চট্টোপাধ্যায়। নিবাস নদীয়া জেলার কুতুবপুর। কর্মস্থান দিনাজপুর জেলার নারায়ণপুর। ওখানকার জমিদারের সেরেস্তায় সুপারভাইজার তিনি। বয়সে তরুণ।

রাত্রি প্রায় আটটা। নলিনীবাবু তাঁর কর্মস্থান নারায়ণপুরে নিজের ঘরে বসে সেরেস্তার কয়েকটি জটিল বিষয়ের কথা ভাবছেন, এমন সময় ঘরের বাতিটি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখলেন অদূরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী। অসম্ভব কাণ্ড। প্রায় তিন মাস আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে স্বগ্রাম কুতুবপুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখানে আসবে সে কি করে? পরক্ষণেই মনে হ'ল স্থূল শরীরে এখানে সে আসতে পারে না—এ নিশ্চয়ই তার অশরীরী মূর্তি।

কিন্তু এ ছায়ামূর্তিই বা তাঁর সামনে এভাবে এসে দাঁড়াবে কেন? চোখের ভুল নয়ত? দুই চোখ ভাল করে রগড়ে নিয়ে আবার তাকালেন সেই দিকে। মূর্তি তেমনি অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে মনে হল মূর্তির মুখটি বড় বিষাদাচ্ছন্ন।

এবার তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন ভয় ধরে গেল নলিনীকান্তের মনে,—কে তুমি, কে তুমি—বলে চীৎকার করে উঠলেন তিনি। পাশের কামরা থেকে ভৃত্য ছুটে এল। দুজন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কই কেউ তো কোথাও নেই! অশরীরী মূর্তি এর মাঝেই হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

নলিনীকান্ত মহা উদ্বেগে পড়লেন: এ ছায়ামূর্তি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করে আনে নি ত? কিন্তু তাই বা হবে কেমন করে? চিঠিপত্রে এ কয়দিনের মাঝে কোন কুসংবাদ পাননি তো তিনি! কুতুবপুর বেশি দূরের পথ নয় বটে তবে সেখান থেকে চিঠি এসে পৌছবার পূর্বেই অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে ভেবে নলিনীকান্ত একবার বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাই বা হয় কেমন করে? কর্তৃপক্ষের তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস, হাতে কতকগুলি জরুরী কাজের ভার, সেগুলি না সেরেই বা যাওয়া হয় কি করে? কয়েকদিন পরেই তো দুর্গাপূজা, হাতের কাজকর্ম সেরে তখন যাওয়াই সমীচীন।

পরের দিনের ডাকেই বাড়ির একখানা চিঠি পেলেন নলিনী-কান্ত: তাঁর স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। এ চিঠি পেয়ে আবার নতুন করে দুশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি: তবে কি এর মাঝেই স্ত্রীর প্রাণবিয়োগ ঘটেছে? মৃত্যুর পরে তার ছায়ামূর্তি তাঁকে এভাবে দর্শন দিয়ে গেল? পরলোক পুনর্জন্ম আত্মা প্রভৃতিতে তেমন বিশ্বাস নেই নলিনীকান্তের। সেই অবিশ্বাসের জোরেই দুশ্চিন্তা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে কোন রকমে প্রবোধ দিয়ে হাতের কাজকর্ম সেরে পূজার ছুটিতে বাড়ি এলেন নলিনীকান্ত, এসে শোনেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী আর ইহজগতে নেই। স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন নলিনী-কান্ত, শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে হিসাব করে দেখেন কর্মস্থানে যেদিন যে সময়ে তিনি স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দেখেন ঐ দিনই ঐ সময়ের ঠিক চার দণ্ড আগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে।

*　　　　*　　　　*

শোকাচ্ছন্ন মনে আধ্যাত্মিক জীবনে আশ্রয় নেবার আগ্রহ জেগেছে নলিনীকান্তের মনে। এ জন্য চাই প্রকৃত একজন সদ্গুরু। এই সদ্গুরু লাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মন। এই সময় কর্মস্থান নারায়ণপুর অবস্থানকালেই এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে নলিনীকান্তের জীবনে। তিনি নিজেই এর বিবরণ দিয়েছেন। লিখেছেন—

"সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! এক রাত্রিতে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি, জানলা দরজা সব বন্ধ, ঘুম হয়নি, তন্দ্রা এসেছে মাত্র, এমন সময় এক জ্যোতির্ময় সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষ আমায় ডেকে বললেন—'নাও বৎস, এই মন্ত্র নাও। তুমি মন্ত্রলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছ। এই আমি তোমার জন্য মন্ত্র নিয়ে এসেছি, ধরো।' কি গম্ভীর সে স্বর! আমি হাত পেতে সেটা নিলাম। মহাপুরুষের অঙ্গ-জ্যোতিতে অন্ধকার গৃহ তখন আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই আলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল—একটি পাতায় কি যেন লেখা আছে; কাছে দেশলাই ছিল, তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দেখি, বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লেখা একাক্ষরী মন্ত্র।

এটি কি মন্ত্র, কেমন করে জপ করতে হয় তা জেনে নেবার জন্য যেমন মন্ত্রদাতার উদ্দেশ্যে মুখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি তিনি আর নেই। দেবমূর্তি অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের দরজা জানালা সব পূর্ববৎ বন্ধ। দুয়ার খুলে পাঁতি পাঁতি করে সব জায়গা খুঁজলাম, পেলাম না, অবাক হলাম, মন যেন কেমন হয়ে গেল। ঘরে এসে মেঝেয় পড়ে আকুলিবিকুলি করতে লাগলাম, চোখের জলে আমার বুক ভেসে যেতে লাগলো। আমার মনে হ'ল—"একি স্বপ্ন? না, স্বপ্ন হ'লে বেলপাতা আসবে কোথা হ'তে? আর ঘরের দরজা যখন ভেতর থেকে বন্ধ, কি করে তখন অন্যের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হতে পারে? মনে হ'ল—আমি কি অন্যায় করলাম। তখন বিল্বপত্রে কি লেখা আছে জানতে ব্যাকুল না হয়ে যিনি আমাকে বিল্বপত্রটি দিলেন, তাঁকে ধরলাম না কেন?

*　　　　*　　　　*

মন্ত্র প্রাপ্তির রহস্য কাশীতে গেলে মিলতে পারে, সেখানে অনেক সাধুমাহাত্মা আছেন—ভেবে কাশী ছুটলেন নলিনীকান্ত। সেখানে কোথাও প্রশ্নের উত্তর মিলল না। উৎকণ্ঠার আবেগে দিশেহারা হয়ে একদিন তিনি ঠিক করলেন মন্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত নির্দেশ কারো কাছে না পেলে তিনি গঙ্গারগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। সেই দিনই গভীর রাত্রে তিনি এক অশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন দিব্য লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত এক ঋষিকল্প মহাপুরুষ তাঁকে বলছেন,—"তুমি দিগ্বিদিকে কোথায় গুরু খুঁজে হয়রান হচ্ছ? তোমার গুরু তো তোমার দেশের নিকটেই রয়েছেন। বীরভূম জেলার তারাপীঠে তুমি যাও। সেখানে গিয়ে মহাতান্ত্রিক বামাক্ষেপার শরণাপন্ন হও, অভীষ্টলাভের পথ তিনিই দেবেন।"

স্বপ্নাদেশে তারাপীঠে গিয়ে তিনি ক্ষেপাবাবার শরণাপন্ন হ'ন। তাঁর কাছে তন্ত্রসাধনায় দীক্ষা নেবার পর সেইখানে থেকেই তিনি তন্ত্রমতে সাধনা করে ইষ্ট দর্শন করেন।

*　　　　*　　　　*

তারাপীঠের শ্মশান।

ক্ষেপাবাবার কাছে দীক্ষা নেবার পর একদিন গভীর নিশীথে তিনি এই মহাশ্মশানে বসে নিষ্ঠা ভরে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করে চলেছেন, মাঝে মাঝে মন একটু উচ্চকিত হ'লেই কানে আসে ক্ষেপাবাবার হুঙ্কার তারা, তারা, তারা! সঙ্গে সঙ্গে মনের সকল ভীতি বিদূরিত হয়।

রাত্রির শেষ যামে ইষ্টদেবী তারা নবীন সাধকের সামনে আবির্ভূত হলেন। স্বামী নিগমানন্দ নিজেই এর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

আমি দেখে বিস্মিত হ'লাম। বললাম, তুমি কে?

সে উত্তর দিল, আমি তোমার ইষ্টদেবী।

আবার প্রশ্ন করলাম, এ মূর্তিতে কেন? এ মূর্তি তো আমার গুরূপদিষ্ট মূর্তি নয়।

সে মূর্তি দেখলে তুমি ভয় পাবে, তাই।

কি সুন্দর সে মূর্তি। দেবী অতঃপর বললেন, বৎস, বর চাও।

আর আমি কি বর চাইব? আমার তো চাওয়ার কিছুই ছিল না, সেই মূর্তি দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই বললাম, যখন ইচ্ছে হবে তখন যেন তোমায় এই ভাবে দেখতে পাই।

আচ্ছা তাই হবে—বলে তিনি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তারপর তাঁর স্বরূপ মূর্তি দেখতে চাইলে, শেষে যাবার সময় তাঁর বিশ্বময় মূর্তি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। সে মূর্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে আমি অচেতন হয়ে পড়লাম। তারপর জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি আমি বামাক্ষেপার কোলে।"

* * *

তারাপীঠ থেকে বেরিয়ে জ্ঞানমার্গের সাধনার গুরু খুজতে তিনি নানা দেশ পর্যটন করতে থাকেন। অবশেষে অভীষ্ট গুরু মিলে যায়। এই গুরু হচ্ছেন মহাবৈদান্তিক সিদ্ধমহাপুরুষ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। এঁর কাছে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় তাঁর নিগমানন্দ সরস্বতী।

সন্ন্যাস নেবার পর গুরুর নির্দেশে তীর্থপরিক্রমায় বেরিয়েছেন নিগমানন্দ, গুরুও তখন সঙ্গে আছেন। বদরিকাশ্রম হয়ে মানস সরোবরে এসেছেন তাঁরা।

একদিন নিগমানন্দ গুরুর পাশে বসে মানসসরোবরের নয়নাভিরাম দৃশ্যের দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে আছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল হ্রদের এক কোণে যেন অপরূপ রূপের মেলা বসে গেছে। আনন্দচঞ্চল একদল অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী সেখানে জলবিহার করছে।

কৌতূহলী নিগমানন্দ গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ে কওঁন সব আস্নান করতে হেঁ?

স্বামীজী উত্তরে বললেন, আরে তুম্হারা আঁখ তো খুল গিয়া।

দেখ লেও, অওর ভি বহুৎ দেখনেকে চীজ হ্যায়। ইয়ে সব তো অপ্সরা হ্যায়।

*　　　*　　　*

পরিক্রমায় বেরিয়ে নিগমানন্দ একবার দ্বারকায় সারদা মঠে এসে হাজির হ'ন। এই সময় মঠে কোন মোহন্ত ছিলেন না। মঠ পরিচালনা করতেন এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী। নিগমানন্দ মঠে যাবার পরই বৃদ্ধা তাঁকে বড় স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন, নিগমানন্দও তাঁকে মা বলে ডাকেন। নিগমানন্দের সাধননিষ্ঠা এবং প্রিয়দর্শন চেহারায় মুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধা শেষে স্থির করলেন, তাঁরা সকলে মিলে তাঁকেই মঠের মোহান্তপদে বসাবেন। মঠে বেশ আদরযত্নে দিন কাটতে লাগল নিগমানন্দের।

এই সময় হঠাৎ একদিন এই মঠে ত্রিশূলধারিণী এক ভৈরবীর আবির্ভাব ঘটল। ভৈরবী পূর্ণযৌবনা এবং পরমা সুন্দরী। শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁর অগাধ। তা ছাড়া কথায় কথায় জানা গেল তিনি সম্ভ্রান্ত বাঙালী ঘরের মেয়ে, পূর্বাশ্রম ছিল যশোরজেলায়।

প্রথম দর্শনেই নিগমান্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তিনি। ঘন ঘন এ মঠে আসতে লাগলেন। নিগমানন্দও যেন এঁর দিকে বেশ কিছুটা ঝুঁকে পড়লেন।

ভৈরবী এসে নিগমানন্দকে প্রায়ই বোঝান তন্ত্রমতে তাঁদের শৈববিবাহ হতে পারে।

বারবার একথা শুনে তরুণ সাধকের মনও কিছুটা নরম হয়েছে। শৈববিবাহ মন্দ কি? বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তো তাঁকে মোহান্ত করতেই চাইছেন। এই তরুণী ভৈরবীকে সহধর্মিণী করে নতুনভাবে ধর্মাচরণ করতেই বা ক্ষতি কি?

এরপরে শৈববিবাহের দিনক্ষণ পাকাপাকি ভাবেই ঠিক হয়ে গেল।

বিয়ের আগের দিন রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন নিগমানন্দ। মহাসমারোহে ভৈরবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মনোহর

বেশে সজ্জিত হয়ে তরুণী ভৈরবী তাঁর পাশে বসেছেন। এমন সময় স্বপ্নজড়িত অবস্থায়ই তিনি অকস্মাৎ একটু দূরে এক ভারী চিমটের আওয়াজ শুনতে পেলেন। এ আওয়াজে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তাঁর: এ যে তাঁর গুরুমহারাজ সচ্চিদানন্দজীর সেই সাড়ে বার সের ওজনের সেই চিমটের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বোবিষ্টা ভৈরবীর দিকে নজর পড়তেই দেখেন দেহটি তাঁর মাখনের মত গলে গলে পড়ছে। দেহের রক্তমাংস চর্ম সব গলে গিয়ে অবশিষ্ট রইল শুধু তাঁর একটা কঙ্কাল করোটি। একটু পরেই দেখা গেল সেই কঙ্কালটিই প্রেম ভরে বাহু প্রসারিত করে তাঁকে আলিঙ্গন করতে আসছে।

এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিগমানন্দের ঘুম ভেঙে গেল, জ্ঞানচক্ষু তাঁর উন্মীলিত হ'ল। তখনই নিজের লোটা কম্বল নিয়ে, তিনি মঠের দরজার দিকে রওনা হ'লেন।

বৃদ্ধাসন্ন্যাসিনী তাঁকে কিছুতেই যেতে দেবেন না, তিনি পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁকে আটকানো সম্ভব হ'ল না।

সন্ন্যাসজীবনের পরম বিপদটি তাঁর গুরুকৃপায় এমনি করেই কেটে গেল। নিগমানন্দজী প্রায়ই বলতেন, সদ্‌গুরু অনেক সময় স্বপ্নের ভিতর দিয়েই আশ্রিত শিষ্যকে সতর্ক করে নির্দেশ দিয়ে প্রকৃত কল্যাণের পথে চালিত করেন।

* *

জ্ঞানী গুরু সচ্চিদানন্দজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরই নির্দেশমত যোগীগুরু খোঁজে বেরিয়েছেন নিগমানন্দজী। এই সময় একদিন রাজপুতানার কোটারাজ্যের অরণ্য পথে চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। ক্ষুৎপিপাসায়ও তিনি তখন বড় কাতর। হঠাৎ এক অপরিচিতা নারী তাঁর নাম ধরে ডেকে কাছে এসে বললে, তোমাকে ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর বলে মনে হচ্ছে, আরও আধমাইলের মত এগিয়ে গেলে সামনেই ছোট একটু কুটীর দেখতে পাবে, সেখানে

গেলেই আহার্য মিলবে, সেখানেই আজ বিশ্রাম করে রাত্রিবাস কর।

কিছুদূর যাবার পর সত্যিই একটা কুটীর চোখে পড়ল। কুটীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এর অধিবাসিনী এক সুন্দরী নারী। পরে অবশ্য জানলেন এই মহিলা যোগসিদ্ধা এক সাধিকা। কিন্তু এই বিজন দুরধিগম্য অরণ্যে তিনি একা কি করে বাস করেন ভেবে তিনি রীতিমত বিস্মিত হলেন।

আহার ও বিশ্রামের পর নিগমানন্দ কথঃ প্রসঙ্গে যখন জানলেন এই অপরূপ তারুণ্যমণ্ডিতা নারীর বয়স ষাটেরও বেশি তখন তাঁর বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়ল। শক্তিধর যোগীগুরুর শিষ্যা হয়ে বহুকাল ইনি যোগসাধনা করছেন।

যোগিনী কথায় কথায় এক সময় তাঁকে বললেন, ছাখো, একটা কথা বলি তোমায়। তুমি আজ এমনি করে এখানে সেখানে না ঘুরে সোজা কলকাতা যাও। সেখানেই তোমার আকাঙ্ক্ষিত যোগীগুরুর দেখা মিলবে।

যোগিনীর কথা শুনে নিগমানন্দ মনে মনে ভাবতে লাগলেন আবার সেই সুদূর কলকাতায় ফিরতে বলছেন ইনি, কিন্তু হাতে যে একটিও পয়সা নেই।

যোগিনী বুঝি সর্বজ্ঞ, নিগমানন্দের মুখের দিকে চেয়েই তিনি বলে উঠলেন, টিকেটের কথা ভাবছ তো? ও জন্যে কিছু ভাবতে হবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে, দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

পরের দিন যোগিনী সেই গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন ট্রেন ধরাতে। স্টেশনের কাছাকাছি এসে তাঁর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, ঐ, ঐ যে স্টেশন দেখা যায়, টিকেট কেটে এবার কলকাতার দিকে রওনা হও।

—এই রহস্যময়ী যোগসিদ্ধা মহিলা সম্বন্ধে নিগমানন্দজী লিখেছেন—

"স্টেশনের কাছে এসে হঠাৎ ফিরে দেখি তিনি আর নেই। তাঁর

এই আকস্মিক অন্তর্ধানে মন যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হ'ল—কি সর্বনাশ! তাঁর মত যোগসিদ্ধা ভৈরবীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম! তৎক্ষণাৎ আমি ছুটলাম সেই জঙ্গলের দিকে। গিয়ে দেখি সে কুটীরও নেই, মেয়েটিও নেই। সবই যেন যাদুমন্ত্রবলে কোথাও উড়ে গিয়েছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু সবই নিষ্ফল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কে সেই মেয়ে?"

* * *

কলকাতা আসবার পর নিগমানন্দ একদল তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আসামে যান। সেখানে গিয়ে কামাখ্যা ও পরশুরাম তীর্থদর্শন করে কিছুদিন একা একা পার্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ করছিলেন, তখনকার কথা।

বিজন অরণ্যপথে চলতে গিয়ে একদিন তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল, ঘন আঁধার নামল বনে। বন থেকে বেরুবার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে বিপুলকায় এক বৃক্ষের কোটরে সে রাত্রির মত আশ্রয় নিলেন।

রাত্রি কেটে গিয়ে সবে ভোর হয়েছে, এমন সময় সেই কোটর থেকেই দেখেন দীর্ঘকায় গৌরকান্তি এক সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে বসে। একরাশ শুকনো পাতা ধুনীর মত তাঁর সামনে জ্বলছে। সন্ন্যাসী বসে তাঁর গাঁজা সাজছেন। নিগমানন্দের মনে ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহল। তিনি নেমে এলেন গাছের কোটর থেকে। সন্ন্যাসীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, ভ্রূক্ষেপ নেই সন্ন্যাসীর।

তিনি গাঁজার কলকেয় কয়েকটা টান দিয়ে সেটা বাড়িয়ে ধরলেন নিগমানন্দজীর সামনে। নিগমানন্দের গাঁজা খাওয়া অভ্যাস নেই, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করাও সাহসে কুলাল না, কোন মতে দু'একটা টান দিয়েই কলকেটা আবার সন্ন্যাসীর হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

সন্ন্যাসী এবার তাঁর সামনের আগুন নিভিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিগমানন্দকে বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। এ নির্দেশ অমান্য করবার শক্তি নিগমানন্দের রইল না, বিনাবাক্য ব্যয়ে তিনি সন্ন্যাসীর পিছুপিছু চললেন। যেতে যেতে এক একবার মনে

হতে লাগল বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার সেই কাপালিকের মত ব্যাপার নয় তো এটা? সন্ন্যাসী কিন্তু একটিবারও নিগমানন্দের দিকে ফিরে চেয়ে দেখছেন না, তাঁর অনুসরণ ও পলায়ন দুই-ই যেন সন্ন্যাসীর কাছে সমান।

কিছুটা পথ চলার পর একটা পাহাড়ের সামনে এসে থামলেন সন্ন্যাসী, নীচে একটা পার্বত্য ঝরণা কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। স্বামী নিগমানন্দ এর পরের ঘটনার একটা মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"এখানে এসে সে আমার দিকে তাকাল। কি সুন্দর মূর্তি! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বিশাল বক্ষঃস্থল, প্রশস্ত ললাট, ঘনকৃষ্ণ কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, লম্বা আকর্ণবিস্তৃত চোখ, চোখে মুখে যেন জ্যোতির ছটা বেরুচ্ছে। দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম।

মনপ্রাণ ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গেল। কখন জানি না, আপনা হতে শরীর তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লো।...তিনি আমায় সস্নেহে হাত ধরে উঠিয়ে মধুর প্রাণ-গলানো স্বরে বললেন, বৎস, সহসা রাত্রি শেষে আমাকে গাছতলায় দেখে, আর তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে বলায়—বোধ হয় অবাক হয়েছ, ভয়ও পেয়েছ। আমি কিন্তু আগেই জেনেছিলাম তুমি কে, কি জন্য ঘুরছো, তোমার অভাব কি, কি জন্য গাছের উপর ছিলে। আমার কাছেই তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হবে। তাই তোমাকে নিয়ে আসবার জন্য আমি ঐ গাছতলায় গিয়ে বসেছিলাম।"

নিগমানন্দ বিস্ময়ানন্দে অবাক্ হয়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এই সন্ন্যাসীই তাহলে তাঁর ঈশ্বর-নির্দিষ্ট যোগীগুরু।

পরে জানতে পারলেন এই সন্ন্যাসীর নাম সুমেরদাস মহারাজ।

পাহাড়ের উপরে খানিকটা উঠে সন্ন্যাসী এক জায়গা থেকে প্রকাণ্ড একখানা পাথর ঠেলে দিতে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক গুহা। গুহাতে দুটি প্রকোষ্ঠ। একটিতে দণ্ড কমণ্ডলু ও আসন, অপরটিতে

থরে থরে সাজানো বহু তালপাতার পুঁথি। নিগমানন্দ শুনলেন সুমেরদাস মহারাজ গুরুপরম্পরায় এগুলি লাভ করেছেন।

আরও শুনলেন যোগীবরের পূর্বাশ্রম ছিল পাঞ্জাবে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের ইনি এক সভাসদ ছিলেন। প্রিন্স দলীপ সিংহের সঙ্গে ইনি ইংলণ্ডে যান। কোন কারণে বিরক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে ইনি রাশিয়া, চীন, তিব্বত ইত্যাদি ঘুরে দেশে ফেরেন। তিব্বতে থাকবার সময় তিনি এক মহাযোগীর কৃপাদৃষ্টিতে পড়েন। ফলে জীবনের এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। তাঁরই কাছে যোগ-শিক্ষা করে ইনি এক মহাসিদ্ধ যোগীতে পরিণত হ'ন।

এই গুহাতেই সুমেরদাসজী নিগমানন্দকে যোগসাধনায় ব্রতী করেন। গুরু তিনমাস ধরে এই তরুণ নিষ্ঠাবান প্রতিভাধর সাধককে নানা গূঢ় সাধনপ্রণালী শিক্ষা দেবার পর বলেন, বেটা, তুমি এবার লোকালয়ে ফিরে যাও। বনের কচু সেদ্ধ খেয়ে যোগসাধনা হয় না, এর জন্য পুষ্টিকর খাবার ঘি দুধ ইত্যাদি খেতে হয়। তুমি মেদিনীপুর চলে যাও, তোমাকে সাহায্য করবার লোক পাবে সেখানে।

মেদিনীপুরের হরিপুর গ্রামে এসে গুরু নির্দিষ্ট সাহায্যকারী ব্যক্তির দেখা পান নিগমানন্দজী। ঘুরতে ঘুরতে একদিন এই গ্রামের এক মন্দিরে রাত্রির জন্য আশ্রয় নেন নিগমানন্দ। পরদিন অতি ভোরেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে এসে হাজির। এঁর নাম সারদাপ্রসাদ মজুমদার। গ্রামের জমিদার ইনি। নিগমানন্দকে দেখামাত্র সারদাবাবু ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, দেখুন, গত রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি সৌম্যদর্শন দীর্ঘকায় জটাজুট-ধারী এক সন্ন্যাসী এসে আমায় বলছেন, তোদের মন্দিরে এক সাধু এসে রাত্রিবাস করছে। যোগসাধনার জন্য তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন। তাঁকে সে সাহায্য তুই যথাসম্ভব করবি, তাতে কল্যাণ হবে তোর। আমার ধারণা আপনিই সেই সাধু।

শুনে নিগমানন্দ বুঝলেন, গুরু সুমেরদাসজীরই এ অলৌকিক লীলা।

সারদাবাবুর বাড়ির পিছনে একটা বাগান ছিল, নবাগত সন্ন্যাসীর জন্য একটা নতুন ঘর তিনি সেখানে তৈরী করিয়ে দেন। নিগমানন্দজী সেখানে থেকে যোগসাধনা করতে থাকেন।

* * *

কয়েক বৎসর পরের কথা। কাশীতে এসে পৌঁছেছেন নিগমানন্দ। অপরিচিত জায়গা। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়েছেন খুব, ক্ষুধার্তও বটে। দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বসেছেন। নিঃসম্বল হয়ে একাকী পরিব্রাজন করাই তাঁর চিরাচরিত রীতি। হাতে পয়সাকড়ি কিছুই নেই—ক্ষুন্নিবৃত্তি কি করে হবে ভাবনা আসছে মনে। এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল,—কাশীতে তো কেউ অভুক্ত থাকে না, এ যে অন্নপূর্ণার স্থান।

ঠিক করলেন গঙ্গার ঘাটে বসে খুব ধ্যান লাগাবেন, অন্নের চেষ্টা কিছুমাত্র করবেন না,—এতে পরীক্ষা করা হয়ে যাবে অন্নপূর্ণার কৃপায় সত্যিই এখানে অন্ন জুটে যায় কি না।

ধ্যাননিমীলিত নেত্রে নিগমানন্দ ঘাটের এক প্রান্তে উপবিষ্ট। সামনে স্নানার্থী সাধুসন্ত গৃহস্থ ভক্তের যাতায়াতের বিরাম নেই। ক্রমে বেড়ে উঠছে বেলা। এর মাঝে হঠাৎ এক স্নানার্থিনী নিগমানন্দজীর সামনে এসে ডাকলে, বাবা!

চোখ মেললেন নিগমানন্দ।

স্ত্রীলোকটি দেখতে বড় কুৎসিত, বৃদ্ধা, পরনের কাপড় ময়লা, ছেঁড়া। সে নিগমানন্দকে বললে, বাবা, আমি চট করে স্নানটা সেরে আসি, এ ঠোঙাটা তোমার কাছেই রইলো।—বলেই বৃদ্ধা উত্তরের কোন প্রতীক্ষা না করে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। দেখেই আবার চোখ বুঝলেন নিগমানন্দ।

এরপর ধ্যানাবেশ তাঁর ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠল, বেলা পড়ে গিয়ে কখন যে সন্ধ্যা হয়েছে, রাত্রির আঁধার ঘনিয়ে এসেছে সেদিকে খেয়ালই নেই। বাহ্যজ্ঞান যখন পুরো ফিরে এল তখন—রাত্রি ন'টায় কম হবে না। ক্ষুধার জ্বালা খুব তীব্র হয়ে উঠেছে।

ভাবতে লাগলেন, এত রাত্রি হয়ে গেল, কিন্তু কই, অন্নপূর্ণার কাশীতে আমার অন্নের তো কোন সংস্থান হ'ল না।

এই ভাবতেই হঠাৎ নজর পড়ল—পাশের তালপাতার ঠোঙাটির দিকে। তাই তো,—সেই কোন্ বেলা দুপুর থেকে এটা এখানে পড়ে রয়েছে। যে বৃদ্ধা এটা রেখে গেল, স্নান সেরে কই,—সে তো আর এল না।

ঠোঙাটা এবার খুলতেই নিগমানন্দ দেখলেন, তাতে রয়েছে এক-গাদা সীতাভোগ আর মিহিদানা। বাঙালীর অতি প্রিয় খাদ্য। প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে তিনি তখনই ঠোঙাটা একেবারে উজাড় করে ফেললেন। ভোজন শেষে কয়েক আঁজলা গঙ্গাজল পান করে একটা মহাতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

সেদিন রাত্রে একটা পরিত্যক্ত গৃহের বারান্দায় শুয়ে নিগমানন্দ ঘুমাচ্ছেন—এমন সময় তিনি স্বপ্ন দেখলেন রূপের ছটায় দশদিক আলো করে জননী অন্নপূর্ণা তাঁর সামনে হাজির হয়ে বলছেন, কেমন বাবা, এবার তো নিজের চোখেই দেখলে আমার কাশীতে কেউ কখনো অভুক্ত থাকে না। আমি নিজের হাতে তোমায় ঐ খাবারগুলি দিয়ে এসেছিলাম।

নিগমানন্দ বললেন, না, মা, তুমি তো আমায় ওগুলি দাওনি, যে আমাকে দিয়েছে, সে তো এক বৃদ্ধা মানবী।

কেন বাবা, যিনি নির্গুণ তাঁর সগুণে আত্মপ্রকাশ করতে বাধা কোথায়? নিরাকারের ক্ষমতা কি সীমাবদ্ধ? যে কোন আকার নিতে তাঁর বাধা কোথায়?

ইন্দোরের শ্রীপাঠক রাজসরকারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। সংসারের সর্ববন্ধন ছিন্ন করে তিনি আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য বড় ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, কিন্তু কোন্ মহাপুরুষের আশ্রয় নেবেন তিনি, কার তত্ত্বনির্দেশে প্রকৃত শান্তি লাভ করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

একদিন নির্জন নদীতীরে বসে আকুল মনে এই কথাই ভাবছেন:

তাঁর জীবনে তত্ত্বদর্শী গুরুর আবির্ভাব কি কিছুতেই হবে না, জীবনটা কি তাঁর বিফলেই যাবে ?

তন্ময় হয়ে তিনি এই চিন্তাই করছেন এমন সময় তাঁর চোখের সামনে আকাশের গায়ে এক দিব্যমূর্তি আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু কে এই মহাপুরুষ! এঁকে তো তিনি কোনদিন দেখেননি। অলৌকিক মূর্তিটি কিন্তু দেখা দেবার একটু পরেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মূর্তির অন্তর্ধানের সঙ্গে তাঁর মনের ব্যাকুলতা আরও বেড়ে উঠল। কে ইনি, কি করে তাঁর সন্ধান পাব—এই চিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে রইলেন।

কয়েক দিন পর আর এক অলৌকিক ব্যাপার। সেদিনও নদী-তীরের সেই জায়গায় এসে বসে সেদিনকার সেই অলৌকিক দর্শনের কথাই ভাবছেন, কৃপা করে কে আমায় দেখা দিয়েছিলেন, তিনিই হয়ত আমার ভাগ্যনির্দিষ্ট গুরু, তাঁর নামটা যদি কোন মতে জানতে পারতাম!

ব্যাকুল হয়ে এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের সামনে জলন্ত অক্ষরে তিনটি শব্দ রূপায়িত হয়ে উঠল: স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস।

এরপর ভক্ত ও সাধুসন্তদের কাছে খোঁজ নিয়ে একদিন নিগমানন্দজীর সন্ধান পান, এবং তাঁর আশ্রয়লাভে নিজের জীবন ধন্য করেন।

*　　　*　　　*

গৃহী ভক্তেরা তাঁদের আপদ বিপদে অনেক সময় নিগমানন্দজীর অলৌকিক কৃপা লাভ করেছেন।

ত্রিপুরার একটি অখ্যাত ক্ষুদ্রগ্রামের এক যুবক,—নাম অশ্বিনী। নিজে, স্ত্রী এবং একটি ছোট ছেলে নিয়ে [illegible]টি নিগমানন্দজীর আশ্রিত। গৃহের এক কোণে গুরু[illegible]র ছবি। সকা[illegible] সন্ধ্যায় পরম ভক্তিভরে বাড়ির সবাই সেখানে প্র[illegible]তি জানায়।

হঠাৎ এক দুঃসাধ্য রোগে অশ্বিনী প্রাণ[illegible] করলে বৃদ্ধা মাতা
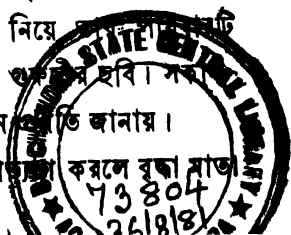
এবং পত্নী শোকে উন্মত্তপ্রায় হয়ে পড়ল। এই সময় গুরুদেবের ছবিটির দিকে নজর পড়তে অশ্বিনীর বৃদ্ধা মাতা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: যে ঠাকুর এমন দুর্দৈবের দিনে নীরবে দর্শক মাত্র হয়ে থাকেন তাঁকে ঘরে রেখে লাভ কি?—আজিই তিনি ছবিটিকে পুকুরের জলে বিসর্জন দেবেন।

ছবিটি নিয়ে তিনি পুকুরে বিসর্জন দিতে যাচ্ছেন এমন সময় পিছন থেকে দরদভরা মধুর কণ্ঠে কার ডাক শোনা গেল—মা!

বৃদ্ধা পিছনে ফিরে চাইতেই দেখেন—গুরুদেব নিগমানন্দ ছলছল চোখে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। বৃদ্ধার ছবিটি আর ফেলা হ'ল না।

নিগমানন্দজী করুণ কণ্ঠে তাঁকে বললেন, চল মা, ঘরে চলো। আমিই তোমার ছেলে। আমি তোমায় মা বলে ডাকব। অশ্বিনীর জন্য কেঁদো না, সে আমার কাছেই আছে।

কখন কোথা থেকে যে স্বামী নিগমানন্দ ত্রিপুরার এক অখ্যাত পল্লীতে আবির্ভূত হ'লেন, অশ্বিনীর মা এবং স্ত্রী তা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁদের নানা ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে আবার তিনি আবার তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গুরুর অন্তর্ধানের পর সবার হুঁশ হ'ল। গুরুদেব যে তাঁর অলৌকিক শক্তিবলেই সেদিন তাঁদের কাছে হাজির হয়েছিলেন এ কথা বুঝতে আর কারো বাকী রইল না।

আর একবারের কথা।

বাড়িতে সমর্থ পুরুষ কেউ নেই বলে স্থানীয় একদল দুর্বৃত্ত অশ্বিনীর বাড়িতে প্রবেশ করে তার বিধবা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হয়। এই সঙ্কটকালে অসহায় বিধবায় ভয়ার্ত ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে নিগমানন্দজী অশ্বিনীর বাড়িতে এসে হাজির হ'ন। তাঁর তেজোদৃপ্ত হুঙ্কারে দুর্বৃত্তগণ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ভয়ার্ত পরিবারটিকে আশ্বস্ত করে নিগমানন্দজী ঘরের বাইরে একটা গণ্ডি এঁকে দেন। বলেন, রাত্রে এই গণ্ডির ভিতরে থাকলে কেউ আর তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।—এই বলেই তিনি অন্তর্হিত হ'ন।

যোগী শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের কথা। রাণীক্ষেতে এক সেনানিবাস তৈরীর আয়োজন চলেছে।

কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণী নামে গ্রাম। সেই গ্রামের গৌরমোহন লাহিড়ীর পুত্র শ্যামাচরণ দানাপুরে সামরিক পূর্তবিভাগে কাজ করতেন, সেখান থেকে সবে বদলি হয়েছেন রাণীক্ষেতে। সামান্য যা কাজ থাকে সকালে তাঁবুতে বসেই তা শেষ করে ফেলেন। তারপর অখণ্ড অবসর। সে অবসর কাটে তাঁর পিওন আর পাহাড়ী কুলীদের সঙ্গে গল্প করে।

সামনেই নাগাধিরাজ হিমালয়। কন্দরে কন্দরে তার কত যোগী, সিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসী তপস্বী। তাঁদের অলৌকিক কাহিনী শোনেন শ্যামাচরণ স্থানীয় লোকদের মুখে। শোনেন—অদূরে যে দ্রোণ-গিরি দেখা যায়—তাতে রয়েছেন অনেক শিবকল্প মহাপুরুষ। শুনে শ্যামাচরণের একদিন বড় অভিলাষ হ'ল—ঐ দ্রোণ-পাহাড়টিকে একবার ভাল করে দেখে আসতে। সেদিন সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পাহাড়টির দিকে বেড়াতে বেরুলেন।

রাণীক্ষেত থেকে দ্রোণ-গিরির দূরত্ব কম নয়, প্রায় পনের মাইল। পাকদণ্ডির আঁকাবাঁকা পথে যেতে যেতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল, সামনে নন্দাদেবীর গিরিশৃঙ্গ অস্তরাগে অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। দূরে চিরতুষারাবৃত পর্বতের তরঙ্গমালা। দ্রোণ-গিরির একেবারে কাছে এসে গিয়ে শ্যামাচরণ আত্মবিস্মৃত হয়ে দেবতাত্মার এই অপূর্ব সৌন্দর্য মুগ্ধ নেত্রে দেখছেন। এমন সময় দ্রোণ-গিরি কম্পিত করে কার কণ্ঠস্বর কানে এল,—শ্যামাচরণ, শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

বুকটা কেঁপে উঠল শ্যামাচরণের, এই জনহীন পার্বত্য অঞ্চলে কে তাঁর নাম ধরে ডাকে। দানাপুর থেকে পাঁচশো মাইল দূরে এসেছেন তিনি, এখানকার কোন লোকের সঙ্গেই ত তাঁর চেনা নেই। তবে?

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর দেখলেন অদূরে এক গুহার সামনে জটাজুটধারী এক মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যেন শ্যামাচরণের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

মহাপুরুষের নয়নে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। তিনি শ্যামাচরণের দিকে এগিয়ে এসে প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে বললেন, শ্যামাচরণ, অব্ তুম আ গয়া? বৈঠ যাও, বিশরাম কর লো। ম্যঁয়হি তুমহে পুকার রহা থা।

শঙ্কা ও সন্দেহের দোলা লাগতে লাগল শ্যামাচরণের মনে। এগিয়ে এসে কোন রকমে একটা প্রণাম সেরে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মন থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব শ্যামাচরণের কিছুতেই যাচ্ছে না: এ সাধু আমার নাম জানলেন কি করে? হয়ত পিওন কিংবা পাহারাদারের কাছ থেকে কৌশলে জেনে নিয়েছেন।

মনে এইসব ভাবনা জাগতেই যোগীবর তাঁর মনের কথা জানতে পেরে অবলীলা ক্রমে তার পিতৃপুরুষের নাম ধাম নিবাস সব এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন। এরপর ঘনিষ্ঠ লোকের মত তাঁর দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদ মৃদু হাসতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর যোগী শ্যামাচরণকে বললেন, বেটা, বৃথা সন্দেহ জাগছে তোমার মনে। আমি তোমার নিতান্ত আপনজন। তোমারই প্রতীক্ষায় এই বিজন দুর্গম গিরিগুহায় অবস্থান করছি। একবার ধীর চিত্তে চিন্তা করে দেখ দেখি এ স্থান তোমার পরিচিত কি না।

শ্যামাচরণ কোন উত্তর দিচ্ছেন না দেখে তিনি হাতছানি দিয়ে তাঁকে গুহার অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। স্বল্পালোকে শ্যামাচরণ দেখলেন গুহার এক কোণে রয়েছে বাঘছাল, ধুনী, দণ্ড ও কমণ্ডলু। সন্ন্যাসী এবার শ্যামাচরণকে বললেন, একবার ভাল করে দেখ তো এগুলি তুমি চিনতে পার কিনা।

কি উত্তর দেবেন শ্যামাচরণ, অনেক চেষ্টা করেও কিছুই তিনি মনে করতে পারেন না।

শ্যামাচরণের অবস্থা দেখে একটু হাসলেন সন্ন্যাসী, তারপর হাত

দিয়ে তাঁর মেরুদণ্ড স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাচরণের মন থেকে যেন একটা যবনিকা অপসৃত হয়ে গেল। মনশ্চক্ষুর সামনে প্রকাশিত হ'ল পূর্বজন্মের অধ্যাত্মসাধনার চিত্রপট। শক্তিধর মহাযোগীর করস্পর্শে এবার ঘুচে গেছে তাঁর জন্মান্তরের ব্যবধান। শ্যামাচরণ চিনলেন এই দণ্ডকমণ্ডলু, ধুনী, বাঘছালের আসন—সবই তাঁর পূর্বজন্মের ব্যবহৃত দ্রব্য, আর আজ যিনি তাঁকে নিয়ে এলেন এ গুহায়, তিনিই তাঁর পূর্বজন্মের গুরু।

যোগীবরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে যুক্তকরে দাঁড়ালেন তিনি তাঁর সামনে। যোগীবর মধুর হেসে বললেন, এবার চিনলে ত তোমার আগের জন্মে ব্যবহার করা জিনিসগুলি? পূর্বজন্মে তুমি আমারই চেলা ছিলে। সাধনার উচ্চস্তরে উঠবার পর দেহান্ত হয়। সাধনার যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু করবার জন্যই তোমার আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। তোমায় দীক্ষা দেবার জন্যেই এখানে রয়েছি আমি।

এরপর কথা প্রসঙ্গে যোগী তাঁকে যেসব কথা বললেন তা শুনে শ্যামাচরণের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। যোগীবর বললেন, তোমাকে টেলিগ্রাম করে যে এখানে আনা হয়েছে তার মূলেও আমি। বদলি তোমায় অন্য স্থানে করবার কথা। সাহেব একস্থানের নাম করতে গিয়ে অন্য স্থানের নাম লিখেছে। তার এ ভ্রান্তি আমিই ঘটিয়েছি। জেনে রাখো আর সাতদিন পরেই তোমার আবার দানাপুর ফিরে যাবার তার আসবে। ততদিনে অবশ্য তোমার সঙ্গে আমার যে কাজ আছে তাও শেষ হয়ে যাবে।

সেদিন অস্তরাগরঞ্জিত দ্রোণগিরির গুহাদ্বারে দাঁড়িয়ে শ্যামাচরণের মনে হ'ল জন্ম জন্মান্তরের এই গুরুর চেয়ে ঘনিষ্ঠজন আত্মার পরমাত্মীয় কেহ আর তাঁর নেই।

প্রথম সাক্ষাতের পরদিনই শ্যামাচরণ যোগীবরের পাহাড়ের কাছে তাঁবু ফেললেন। আফিসের সামান্য যা কাজ তা ঐখানে বসেই করেন, তারপর উপস্থিত হ'ন যোগীবরের গুহায়।

শুভলগ্নে একদিন তাঁর স্বামীজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন গুরু মহারাজ শ্যামাচরণকে বললেন, বাবা, এবার যে তোমার রানীক্ষেত ছেড়ে যেতে হবে, দানাপুর ফিরে যাবার তার আসছে। শুনে অশ্রু নামল শ্যামাচরণের চোখে। গুরু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ করো না, বাবা, কোন প্রয়োজনে তুমি আমায় স্মরণ করলে তখনই তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে।

* * *

রানীক্ষেত থেকে দানাপুর ফিরবার পথে শ্যামাচরণ দুই তিনদিন মোরাদাবাদে কাটান। এই সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। শ্যামাচরণ তাঁর কয়েকজন বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনা করছেন এমন সময় এঁদের মাঝ থেকে হঠাৎ একজন বলে বসলেন, কই, এ যুগে আর অলৌকিক যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন সাধুর দর্শন মেলে কই ?

শ্যামাচরণ অমনি দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, সে কি কথা! এমন সাধুর দর্শনলাভ মোটেই অসম্ভব নয়। ইচ্ছা করলে ধ্যানবলে আকর্ষণ করে এনে আমিই দেখাতে পারি।

কৌতূহলী বন্ধুর দল তখন তাঁকে ধরে বসলেন, পার ত একবার দেখাও না ভাই! আমরা চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি।

বন্ধুদের অনুরোধ এড়ানো দায় হয়ে উঠল শ্যামাচরণের, গুরুদেবের করুণার কথা প্রকাশ করে ফেলেছেন বন্ধুদের কাছে। তাছাড়া গুরুদেবের মর্যাদার কথাও যে জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে।

শ্যামাচরণ বাধ্য হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা তা হ'লে আমায় একটা নির্জন ঘর দাও। দরজা জানলা বাইরে থেকে বন্ধ রাখতে হবে।

দীক্ষার অল্প কয়েকদিন পরেই এমন দুঃসাহস হবার কারণ হচ্ছে গুরুর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যখন তিনি অতিমাত্রায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন তখন তাই দেখে গুরু বলেছিলেন, বেটা, তুমি কাতর হয়ো না, তুমি স্মরণ করলেই আমি তোমার সামনে আবির্ভূত হ'ব।

গুরুর এই প্রতিশ্রুতিই ছিল শ্যামাচরণের একমাত্র ভরসা।

যাই হ'ক বন্ধুদের তাক লাগাবেন বলে তিনি নির্জন ঘরে গিয়ে একমনে যোগীবরকে আহ্বান জানালে তিনি সূক্ষ্ম দেহে এসে সেই প্রকোষ্ঠে স্থূলরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

আসন গ্রহণ করবার পর মহাযোগী বললেন, বেটা, তোমার আহ্বানে আমি এসেছি। কিন্তু এ কি ছেলেমানুষি তোমার, সামান্য তর্কস্থলে সাধু দেখাবার উৎসাহে তুমি আমায় এতদূর টেনে আনলে ?

গুরু কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর শ্যামাচরণ নতমুখে বসে রইলেন. বুঝলেন মহাপুরুষের কৃপার অপব্যবহার করেছেন তিনি, এ অপরাধ অমার্জনীয়।

যোগীবর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, শোন, শ্যামাচরণ, আমার নিজের প্রতিশ্রুতি এবং বন্ধুদের কাছে তোমার সম্মান রক্ষার জন্য আমি আজ এখানে হাজির হয়েছি। কিন্তু বলে রাখছি এরপর তুমি স্মরণ করলেই আমার দেখা আর পাবে না, প্রয়োজন মত আমি স্বেচ্ছায় তোমার কাছে আবির্ভূত হ'ব।

অনুতপ্ত শ্যামাচরণ গুরুর চরণ ধরে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন, তাছাড়া বললেন, নিজের কৌতূহল নয়, অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস আনবার জন্যই তিনি এই গর্হিত কাজটি করে ফেলেছেন। এরপর তিনি বহু মিনতি করে যোগী মহারাজকে বললেন, গুরুদেব, যদি কৃপা করে এসেছেনই তখন সকলকে একবার দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করে যান।

যোগীবরের নির্দেশে তখন কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করা হ'ল। শ্যামাচরণের বন্ধুরা সব বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন, যোগীবরের এ অলৌকিক আবির্ভাবে তাদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তাঁরা মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে বুঝলেন এ কোন ইন্দ্রজাল নয়।

গুরুজী কৃপা করে এসেছেন, তাঁকে ত কিছু ভোগ নিবেদন করা প্রয়োজন। শ্যামাচরণ শুদ্ধভাবে কিছু লুচি হালুয়া তৈরী করে আনলেন। মহাত্মার ভোজনের পর সবাইকে প্রসাদ দেওয়া হ'ল।

*　　　　*　　　　*

দানাপুর এসে আফিসের কর্মের শেষে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যোগসাধনা করে যেতেন। তাঁর স্বভাবের জন্য তাঁর উপরওয়ালা সাহেব তাঁকে বেশ একটু স্নেহ করতেন।

একবার সাহেবকে কয়েক দিন যাবৎ বড় বিষণ্ণ থাকতে দেখে শ্যামাচরণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্যার, কিছুদিন যাবৎ আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখছি, কি হয়েছে জানতে পারি কি?—অন্য কোন কর্মচারী এরূপ প্রশ্ন করলে সাহেবের কাছে সেটা হ'ত ধৃষ্টতা, কিন্তু শ্যামাচরণের বেলায় অন্য কথা, সাহেবের স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন, তিনি সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন বলে সাহেব তাঁকে পাগলাবাবু বলে ডাকতেন।

যাই হ'ক পাগলাবাবু তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করছেন বুঝে উত্তর দিলেন তিনি। উত্তরে জানালেন তাঁর স্ত্রী ইংলণ্ডে গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী, প্রাণ রক্ষা হয় কিনা সন্দেহ। শুধু তাই নয়, কিছুদিন যাবৎ দেশ থেকে কোন খবরও পাওয়া যাচ্ছে না। এই জন্যই তিনি বড় চিন্তায় আছেন

শ্যামাচরণের অন্তর করুণায় ভরে উঠল। তিনি বললেন, আচ্ছা, আজই আপনাকে আমি তাঁর খবর এনে দিচ্ছি।

পাগলাবাবুর কথায় অবশ্য তিনি কোন আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না, তবু তাঁর জন্য শ্যামাচরণের সহানুভূতি সাহেবের অন্তর স্পর্শ করল। ভারতীয় যোগীদের অনেক অলৌকিক শক্তির কথা অবশ্য তাঁর কানে গেছে, কিন্তু তাঁরই অধীনস্থ একজন সাধারণ কর্মচারীর মাঝে সে রকম কোন শক্তি যে থাকতে পারে সে কথা ভাবতেই বা তিনি কি করে পারেন? উদাস চোখে শ্যামাচরণের দিকে শুধু চেয়ে রইলেন।

শ্যামাচরণ এরপর আফিসের এক নির্জন কক্ষে গিয়ে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সাহেবকে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, আপনার স্ত্রী আরোগ্যলাভ করেছেন।

শীগগিরই তিনি নিজের হাতে আপনাকে চিঠি লিখবেন। শুধু তাই নয় সে চিঠিতে তিনি কি লিখবেন তাও শ্যামাচরণ সাহেবকে বলে দিলেন।

পাগলাবাবুর কথায় যে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন তা নয়, তবু কেন না জানি তাঁর মনের উদ্বেগ কিছুটা দূর হয়ে গেল।

কয়েক দিন পরেই যখন মেমসাহেবের চিঠি এসে পৌঁছল তখন সাহেবের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সব চেয়ে বেশি বিস্ময়ের কথা স্ত্রী যে যে কথা লিখবেন বলে পাগলাবাবু বলেছিলেন, চিঠিতে সেই সব কথাই আছে, সেই ভাষাতেই।

কয়েক মাস পরে উক্ত সাহেবের স্ত্রী ইংলণ্ড থেকে দানাপুরে এসে গেলেন। আসার পর হঠাৎ একদিন শ্যামাচরণকে দেখে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত রইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই লোকটা এখানে ? এঁকে যে আমি ইংলণ্ডে থাকতে দেখেছি, আমার রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইনি। আমার জীবনের যখন কোন আশাই ছিল না, তখন এঁরই কৃপায় অলৌকিক ভাবে আমার রোগমুক্তি ঘটেছে।

নিজের আফিসেরই পাগলাবাবু যে এমন যোগবিভূতির অধিকারী স্ত্রীর মুখে সে কথা শুনে সাহেব যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

* * *

সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর লাহিড়ী মশায় কাশীতে এসে বাস করেন। এখানে কিছুদিন থাকবার পর কাশীর লোকেরা তাঁকে 'কাশীর বাবা' এবং 'যোগীরাজ' আখ্যা দেন।

লাহিড়ী মশায় কাশীর গরুড়েশ্বর মহল্লায় বাস করবার সময় যুক্তেশ্বর নামে তাঁর এক অন্তরঙ্গ শিষ্য প্রায়ই তাঁকে দর্শন করতে আসতেন, আর যুক্তেশ্বরের সঙ্গে আসতেন রাম নামে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

হঠাৎ একদিন রামের কলেরা হ'ল, এশিয়াটিক কলেরা। যুক্তেশ্বর

উৎকণ্ঠিত হয়ে গুরুদেবের কাছে ছুটলেন। গুরুদেব সব কিছু শুনে বললেন ভাল ডাক্তার দেখাতে। এ রকম ক্ষেত্রে এই ছিল তাঁর রীতি। গুরুদেবের কথায় যুক্তেশ্বর শহরের দুইজন দক্ষ অভিজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তার্তে কিছু ফল হ'ল না। ডাক্তাররা কোন কিছু করতে না পেরে হতাশ হয়ে শেষের দিকে বললেন, আর বড় জোর দু'ঘণ্টা।

শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন যুক্তেশ্বরের গুরুদেবের কাছে। গিয়ে জানালেন সংকটাপন্ন অবস্থার কথা। যোগীর প্রশান্ত মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। যুক্তেশ্বরের চোখে তখন জল এসে গেল। লাহিড়ী মশায় তাই দেখে ধীর কণ্ঠে শুধু বললেন, যাও ডাক্তাররা ত দেখেছেন, ভয় কি ?

উদ্বেগ নিয়ে রোগীর কাছে ফিরে এসে শুনলেন, আর কোন আশা নেই জানিয়ে ডাক্তাররা চলে গেছেন।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাম অতি ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু বন্ধুকে বলতে পারলেন, ভাই, গুরুদেবকে বলো—আমি চললাম। হ্যাঁ ভাই, আর একটা কথা, দাহ করবা. সময় আমার দেহটাকে যেন তিনি শ্রীচরণ-স্পর্শ দিয়ে ধন্য করেন।

মৃত্যুর পর রামের প্রাণহীণ দেহটা ঘরের মাঝে ফেলে রেখে আবার ছুটলেন যুক্তেশ্বর গুরুর কাছে।

কি রে, কি খবর, রাম এখন কেমন আছে,—জিজ্ঞাসা করলেন গুরুজী।

গুরুর মুখে এই কথা শুনে যুক্তেশ্বর নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না, ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আর কেমন আছে। আসুন একবার স্বচক্ষেই দেখবেন, গুরুদেব, সে কেমন আছে। তার দেহ এবার শ্মশানে নিয়ে যাবার উদ্যোগ চলেছে।

শান্ত হও,—বলে যোগীবর এবার চোখ বুজলেন। ধ্যানাবিষ্ট মূর্তি তাঁর কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে রইল। তারপর বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলে সামনের দীপাধার থেকে কিছুটা রেড়ীর তেল নিয়ে একটা

পাত্রে করে যুক্তেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন, এখনি গিয়ে তোমার বন্ধুকে এটা পান করিয়ে দাও।

গুরুর কথা শুনে যুক্তেশ্বর ত একেবারে অবাক : কাকে তিনি এ জিনিস পান করাবেন, রামের মৃত্যু যে তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার এ কথাও তাঁর মনে হ'ল,—গুরুদেব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, সর্বজ্ঞ পুরুষ, বাজে কথা বলেন না, বলতে পারেন না। তাঁর নির্দেশ মত কাজ অবশ্যই তাঁর করতে হবে।

—এই ভেবে অতি দ্রুতপদে তিনি ঘরে ফিরে এসে দেখেন রামের দেহ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, প্রাণের চিহ্নমাত্র তাতে নেই। তবুও কোনমতে মৃতের মুখটি ফাঁক করে কয়েক ফোঁটা তেল তাতে ঢেলে দেওয়া হ'ল।

এরপর যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটল তা দেখে উপস্থিত সকলে একেবারে 'থ' ; রামের প্রাণহীন স্পন্দনহীন দেহে ধীরে ধীরে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল, ক্রমে তাঁর পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরে এল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। তিনি দেখছিলেন তাঁর গুরুদেব এক জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরে তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন, আর কত ঘুমাবে রাম, জাগো, ওঠ, আর যত শীগগির পারো আমার কাছে এস।

যুক্তেশ্বর বলেছেন রামের পুনর্জীবন লাভের ব্যাপারটা নিজের চোখে না দেখলে এটা তাঁর কাছে একটা আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হ'ত। তাঁর আরও বিস্ময় জাগল যখন তিনি দেখলেন রামের সংজ্ঞা ফিরে আসবার পরেই তিনি ধীরে ধীরে উঠে জামা কাপড় পরে গুরুদেবের কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

হেঁটে যাওয়া অবশ্য সম্ভব হয় নি, বন্ধু যুক্তেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে তিনি লাহিড়ী মশায়ের কাছে হাজির হ'ন।

* * *

চন্দ্রমোহন নামে লাহিড়ী মশায়ের এক প্রতিবেশী যুবক ডাক্তারি পাশ করে তাঁকে প্রণাম করতে এসেছেন। যোগীরাজ তাঁকে আশীর্বাদ

করবার পর তাঁকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কত কি উন্নতি হয়েছে সে সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। চন্দ্রমোহন এতে পরম উৎসাহ বোধ করে আধুনিক দেহ-বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

যোগীবর এবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, আচ্ছা, চন্দ্রমোহন, তোমাদের ডাক্তারি মতে মৃত্যুর কি সংজ্ঞা আমায় বিশদ করে বলো ত ?

চন্দ্রমোহন চিকিৎসাশাস্ত্রে মৃত্যুর যে সব লক্ষণের উল্লেখ আছে তা পর পর বিবৃত করে নিজের বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন।

যোগীবর তখন সহসা বলে উঠলেন, আচ্ছা, আমায় ভাল করে পরীক্ষা করে বলো ত,—আমি এখন জীবিত না মৃত ?

চন্দ্রমোহন তাঁর দেহটি পরীক্ষা করতে গিয়ে ত একেবারে স্তম্ভিত। খুব খুঁটিয়েই পরীক্ষা করলেন তিনি যোগীরাজের দেহটি। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার কোন লক্ষণই নাই, হৃদ্‌যন্ত্র নিঃশব্দ নিশ্চল। সারা দেহে প্রাণের কোন স্পন্দনই খুঁজে পাওয়া গেল না।

কিছুক্ষণ পর লাহিড়ী মশায় চোখ মেলে তরুণ ডাক্তারকে বললেন, শোন, চন্দ্রমোহন, মনে রেখো, তোমাদের এই স্থূল জগতের জ্ঞানের বাইরে সূক্ষ্মলোক বলে একটা লোক আছে, তার অনেক তত্ত্ব এবং তথ্যই আমাদের বিজ্ঞানীদের এখনও জানতে বাকী আছে। তাঁরা তাঁদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে যেখানে উপনীত হতে পারেন না, ভারতের আধ্যাত্মিক সাধকেরা তাঁদের যোগশক্তি বলে অনায়াসে সেখানে পৌঁছে যান।

* * *

লাহিড়ী মশায় কখনো ক্যামেরায় নিজের প্রতিচ্ছবি তুলতে দিতে চাইতেন না। একবার কয়েকজন শিষ্য এবং ভক্তের পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি রাজী হ'লেন। কাশীর সুদক্ষ ফটোগ্রাফার গঙ্গাধরবাবুকে ডেকে আনা হ'ল। তাঁর শক্তিশালী নিখুঁত ক্যামেরা নিয়ে এলেন তিনি।

যন্ত্রটির নির্মাণ কৌশল ও বিশেষত্ব জানবার জন্য লাহিড়ী মহাশয় বালকের ন্যায় কৌতূহলী হতে দেখা গেল। গঙ্গাধরবাবু সানন্দে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝালেন।

এবার ছবি তোলার পালা। গঙ্গাধরবাবু মহাবিপদে পড়লেন। যোগীবরকে ক্যামেরার সামনে যথাযথ বসানো হ'ল বটে, কিন্তু ক্যামেরার 'ভিউপয়েণ্টে' যোগীরাজের মূর্তি কিছুতেই প্রতিফলিত হয় না। বারবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল যান্ত্রিক গোলযোগের চিহ্নমাত্র নেই। আরও আশ্চর্যের কথা অন্য যে কোন লোককে সামনে বসানো মাত্র তার মূর্তি ঠিকমত প্রতিফলিত হচ্ছে ক্যামেরার ভিউপয়েণ্টে, কেবল লাহিড়ী মশায়ের বেলায়ই এর ব্যতিক্রম।

এ ব্যতিক্রমের কোন কারণ নির্ধারণ করতে না পেরে গঙ্গাধরবাবু একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

এতক্ষণ যোগীবর কোন কথা না বলে কেবল হাসছিলেন, এবার বলে উঠলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের বিজ্ঞান কি বলে?

ফটোগ্রাফার কাতর হয়ে বললেন, দূর হ'ক বিজ্ঞান, আমি আপনার চরণেই শরণ নিচ্ছি। কৃপা করুন আপনি, আপনার ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হ'তে সুযোগ দিন, আমি আপনার ছবি তুলে নিজের মান বাঁচাই।

মুচকি হেসে যোগীবর এবার ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হলেন, বললেন, দেখুন এবার ছবি আসে কিনা। গঙ্গাধরবাবু দেখলেন লাহিড়ী মশায় এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিউফাইণ্ডারে নিখুঁতভাবে যোগীরাজের প্রতিচ্ছবি এসে গেছে। সেদিন গঙ্গাধরবাবুর ক্যামেরায় যোগীবরের যে ছবিটি তোলা হয় তা থেকেই তাঁর বহু প্রচারিত তৈলচিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছে।

* * *

অভয়া নামে যোগীরাজের এক শিষ্যা ছিল। কলকাতায় এক নামকরা উকিলের সহধর্মিণী তিনি। পরপর আটটি সন্তান হয়ে তাঁরা মারা গেছে। মনে দুঃখের অবধি নেই। অভয়া গুরুর চরণ ধরে বহু মিনতি করে বললেন, গুরুদেব, আমার এর পরের সন্তানটি হয়ে যেন জীবিত থাকে, এ দয়া আমায় করতেই হবে।

ভক্তবৎসল যোগীরাজ বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। এবারকার সন্তান হবে তোমার একটি কন্যা। সে ভালমত বেঁচেও থাকবে। কিন্তু এরজন্য তোমার কিছু করণীয় আছে তা তোমাকে আগে থেকে বলে দিচ্ছি। মনে রেখো, যা বললাম করতে ভুলো না।

শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবে রাত্রিকালে। সারা রাত আতুর ঘরে একটা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে, তাছাড়া সে ঘরে সে রাত্রিতে যারা থাকবে তাদের কেউ যেন ঘুমিয়ে না পড়ে, আর প্রদীপটাও কোন মতে নিভে না যায়।

বছরখানেক পরে মহিলার একটি কন্যা সন্তান লাভ হ'ল—রাত্রিতেই। গুরুদেবের নির্দেশ মত সূতিকাগারে একটা তৈল-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার ব্যবস্থাও হ'ল। শেষ রাত্রিতে কিন্তু দেখা গেল প্রসূতি এবং ধাত্রী দুইজনই নিদ্রামগ্ন। তা ছাড়া প্রদীপের তেলও ফুরিয়ে এসেছে, প্রদীপ নিবুনিবু।

এই সময় সূতিকাগারে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। বাতাসে ঘরের দরজাটা হঠাৎ গেল খুলে। তার আওয়াজে অভয়ার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি দেখেন তাঁর গুরুদেব ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রদীপ শিখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছেন, অভয়া, চেয়ে দেখ, বাতি নিবে যাচ্ছে।

অভয়া অমনি ব্যস্ত হয়ে দীপাধারে তেল ঢেলে দিলেন। এরপর দরজার দিকে চেয়ে দেখেন—গুরুদেব আর সেখানে নেই।

এর পরের কথা।

অভয়া গুরুদর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বেনারস-

একস্‌প্রেস ছেড়ে দিল, গাড়িতে ওঠা আর হ'ল না। গুরুর মূর্তিখানি স্মরণ করে বেদনার্ত অভয়া অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখা গেল—প্লাটফর্মের কিছুটা গিয়েই ট্রেনটা থেমে গেল। কেন থামল—ড্রাইভার বা ইনজিনীয়ার কেউই তার কারণ খুঁজে পেলেন না। যাই হ'ক এই সুযোগে অভয়া তার মালপত্র নিয়ে কামরায় উঠে বসলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি ঠিক হয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন আবার চলতে সুরু করল।

কাশীতে পৌঁছে অভয়া গুরুদেবকে প্রণাম করতেই তিনি স্মিত-হাসি হেসে শিষ্যাকে বললেন, গাড়ি ধরতে হ'লে একটু আগে বেরুতে হয়। কত ঝঞ্ঝাটেই না তোমরা আমায় ফেলতে পার। পরের ট্রেনে কাশী এলে তোমার এমন কি ক্ষতি হ'ত বলো ত? আর সব তাতে তোমার এত কান্নাই বা কেন পায়।

* * *

এক ভক্তিমতী শিষ্যা লাহিড়ী মশায়ের কাছ থেকে তাঁর একখানা ফটো চেয়ে নেন। ফটোটা দেবার সময় লাহিড়ী মশায় তাঁকে বললেন, যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে তা হলে এটাই হবে তোমার এক পরম আশ্রয়, আর তা না থাকলে এটা হবে নেহাৎ একটা সাধারণ ছবি।

কিছুদিন পরে উক্ত মহিলা তাঁর এক গুরু ভগিনীর সঙ্গে বসে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করছিলেন, সামনের টেবিলে স্থাপিত গুরুদেবের সেই ফটো। এমন সময় হঠাৎ ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টি সুরু হ'ল আর সেই ঘরেই হ'ল বজ্রপাত। যে গ্রন্থটি তাঁরা পাঠ করছিলেন বজ্রাগ্নিতে সে গ্রন্থটি পুড়ে গেল, কিন্তু গুরুকৃপায় মহিলা দু'জন বেঁচে গেলেন। দুর্ঘটনার সময় তাঁদের যে অনুভূতি হ'ল,—সেটা হচ্ছে এই। তাঁরা বেশ অনুভব করলেন—কার কল্যাণ হস্ত একটি বরফের প্রাচীর দ্বারা বজ্রবিদ্যুতের আঘাত থেকে তাঁদের রক্ষা করছে।

* * *

কালীকুমার বাবু কিছুদিন আগে লাহিড়ী মশায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি সাধন করে যাচ্ছেন।

প্রায়ই তিনি গুরুদেবের চরণ দর্শন করতে আসেন। তাঁর আফিসের মনিব লাহিড়ী মশায়কে নিয়ে প্রায়ই নানা ঠাট্টাবিদ্রূপ করেন। একদিন ভদ্রলোক কালীকুমার বাবুর পিছনে পিছনে লাহিড়ী মশায়ের গরুড়েশ্বর মহল্লার বাড়ীতে এসে হাজির হ'লেন। উদ্দেশ্য তাঁর—যোগীবরের ধর্মাচরণ অসার প্রতিপন্ন করা এবং কিছুটা তাঁকে অপমান করে যাওয়াও বটে।

এঁরা যখন এলেন যোগীবর তখন দশবারো জন ভক্ত নিয়ে বসে ছিলেন, নবাগত ভদ্রলোক কালীকুমারের সঙ্গে তাঁদের সামনে বসলেন।

তিনি আসন গ্রহণ করা মাত্র যোগীরাজ গম্ভীর স্বরে তাঁর শিষ্যদের বলে উঠলেন, অদ্ভুত কিছু দেখতে চাও তোমরা আজ?

সবাই বলে উঠলেন, চাই, গুরুদেব, চাই।

ঘরটি তা হ'লে আঁধার করো।

তাঁর কথায় ঘর আঁধার করা হ'লে যোগীবরের যোগশক্তি-প্রভাবে তার মাঝে এক অলৌকিক দৃশ্য ফুটে উঠল। সকলে দেখলেন এক সুন্দরী তরুণী লালপাড় শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে আছে।

লাহিড়ী মশায় তখন কালীবাবুর মনিবকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, দেখুন ত এই স্ত্রীলোকটিকে আপনি চিনতে পারেন কিনা?

আগন্তুক তখন ভীত বিব্রত কণ্ঠে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, এ আমার পরিচিত।

ভয়ে লজ্জায় ভদ্রলোকের মুখ তখন বিবর্ণ হয়ে গেছে। যোগীবরের যোগৈশ্বর্য প্রভাবে কিছুই তাঁর গোপন করা চললো না, সর্বসমক্ষে অকপটে তাঁকে স্বীকার করতে হ'ল এই স্ত্রীলোকটি তাঁর উপপত্নী। নিজের স্ত্রীপুত্র থাকা সত্ত্বেও এর পিছনে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছেন।

যোগীবরের যোগশক্তির প্রভাব ভদ্রলোকের অন্তরে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। অনুতপ্ত হয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি যোগীরাজকে বললেন, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, এ পাপ-মোহ থেকে

আমায় রক্ষা করুন। দয়া করে আমায় দীক্ষা দিয়ে শ্রীচরণে স্থান দিন।

অন্তর্যামী যোগী বুঝলেন, ভদ্রলোকের এ আর্তি এ অনুশোচনা সাময়িক। বললেন, বেশ, আগামী ছয়মাস যদি আপনি সংযত হয়ে চলতে পারেন তবে আপনার এ প্রার্থনা পূর্ণ হবে, আপনাকে আমি দীক্ষা দেব।

ভদ্রলোক অবশ্য তা পারেননি। তিন মাস সংযত হয়ে চলবার পরই তিনি ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আবার মিলিত হন। এবং এর দু'মাস পরেই তার মৃত্যু ঘটে। এমন হবে জানতে পেরেই যোগীরাজ সেদিন তাঁকে দীক্ষা দেন নি।

* * *

লাহিড়ীমশায় একদিন তাঁর ভক্তদের নিয়ে বসে নানা ধর্মালোচনা করছেন এবং ঐ প্রসঙ্গেই ভগবদগীতার কোন কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করছেন। এমন সময় হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে উঠলেন, তোমরা একটু চুপ করে ব'স ত, আমি অনুভব করছি বহুলোকের জীবন ও চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজে জাপানের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি।

একি বলেন গুরুদেব ?—ভক্তেরা সব শুনে ভেবে পান না। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরই অবশ্য যোগীবর আবার তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন।

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন পরদিন সংবাদপত্র পড়ে তাঁদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। একখানা যাত্রীবাহী জাহাজ জাপানে আসছিল, কূলের কাছাকাছি এসে সেখানা ডুবে যাওয়ায় বহু নরনারীর প্রাণনাশ ঘটেছে। যে সময় যোগীরাজ ঐ কথা বলেছিলেন ঠিক ঐ সময় দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

ভক্তেরা বুঝলেন নিমজ্জমান জাপান-যাত্রীদের মর্মবিদারী আর্ত-নাদই আগের দিন যোগীরাজের অন্তরে প্রতিফলিত হয়েছিল।

* * *

দেহ রক্ষার পূর্বের কথা।

যোগীরাজের শিষ্য প্রণবানন্দজী তখন কাশীধামের বাইরে ছিলেন। গুরুদেবের অন্তিম অবস্থার কথা শুনে তিনি ব্যাকুল হয়ে কাশীযাত্রার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় লাহিড়ীমশায় এক অলৌকিক মূর্তিতে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তাড়াহুড়ো করে কাশীতে রওনা হবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। সেখানে এসে ত আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে না, তুমি আসবার আগেই আমি নরদেহ ছেড়ে চলে যাব।

প্রণবানন্দজী শুনে কাঁদতে লাগলেন।

এ কি, কাঁদছ কেন? আমি ত সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গ রয়েছি। দেহ গেল ত কি হয়েছে, আমার সত্তা ত থাকবে, তাকে তোমরা পাবে, প্রয়োজন হ'লেই পাবে।

কেশবানন্দ নামে লাহিড়ীমশায়ের আর এক শিষ্যও এই সময়-কার এক অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করেছেন। গুরুদেবের দেহ-রক্ষার কয়েকদিন আগে তিনি হরিদ্বারের একটি কুটীরে বসে আছেন এমন সময় যোগীরাজ তাঁর সামনে এক জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তুমি এখনই কাশীতে চলে এস। এই বলেই মূর্তিটি অন্তর্হিত হ'ল।

কেশবানন্দ অনতিবিলম্বে কাশীতে চলে এসে দেখলেন, গুরুদেবের দেহরক্ষার আর দেরী নেই। ভক্ত শিষ্যগণ দিবারাত্র তাঁকে ঘিরে বসে সেবা করছেন।

১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেই উপবিষ্ট ভক্তদের কাছে ধীরে ধীরে গীতার কয়েকটি প্রিয় শ্লোক ব্যাখ্যা করছিলেন, হঠাৎ বলে বসলেন, তাই ত, এবার আমার নিজের জায়গায় যাবার সময় হয়ে গেছে।

গুরুর এই কথা শুনে শিষ্য ভক্তেরা সব কাঁদতে লাগলেন আর তিনি ধীরে ধীরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হ'লেন। এই আসনেই সমাধিস্থ হয়ে তিনি তাঁর জীর্ণ দেহটি ত্যাগ করে নিজ ধামে চলে গেলেন।

ত্রৈলঙ্গস্বামী

অন্ধ্রের ভিজিয়ানা গ্রাম অঞ্চলে হোলিয়া নামে এক গ্রাম। এখানকার ভূম্যধিকারী নরসিংহ রাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবরাম ছেলেবেলা থেকেই সংসার-বিরাগী, আধ্যাত্মিক জীবনলাভের প্রয়াসী। পিতামাতার শিবারাধনার ফলেই তাঁর জন্ম।

পিতামাতার মৃত্যুর পর গ্রামের শ্মশান-প্রান্তে পর্ণ কুটীর বেঁধে বিশ বৎসর সাধনা করবার পর শিবরামের ঈশ্বর নির্দিষ্ট গুরু এলেন সেখানে। যোগী গুরু। পাঞ্জাবের বাস্তর গ্রামের ভগীরথানন্দ সরস্বতী।

গুরু শিবরামকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে এলেন পুষ্কর তীর্থে। এইখানেই শিবরামের সন্ন্যাস গ্রহণ। বয়স তখন তাঁর আটাত্তর। সন্ন্যাসের পর নাম হ'ল তাঁর গণপতি সরস্বতী। কিন্তু তিনি তেলঙ্গ দেশ থেকে এসেছেন বলে কাশীতে থাকবার সময় কাশীর লোকজন তাঁকে ত্রৈলঙ্গস্বামী বলত।

পুষ্কর তীর্থে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে গণপতি সরস্বতী দশ বৎসর কঠোর যোগ সাধনা করেন। গুরু দেহ রাখবার পর অষ্টআশি বছর বয়সে তিনি ভারতের অন্যান্য তীর্থ পরিক্রমায় বেরোন।

এবার তাঁর যোগ বিভূতির কথায় আসা যাক।

আরও কয়েক বৎসর পরের কথা। তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে এসেছেন তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। তখন মেলা বসেছে সেখানে। পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে বড় মেলা। অনেক সাধুসন্ত সংসারী ভক্তের ভিড়। তীর্থমেলায় এক ব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ তনয় প্রাণ ত্যাগ করেছে। মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন চলেছে। মৃতের আত্মীয় পরিজনের বিলাপ ও ক্রন্দন এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে।

কমণ্ডলু হাতে বিশালকায় এক সন্ন্যাসী পাশ দিয়ে যেতে ঐ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন, অন্তরে জাগল তাঁর করুণার আলোড়ন।

সন্ন্যাসী তাঁর কমণ্ডলু থেকে কিছুটা জল নিয়ে বিড় বিড় করে কি মন্ত্র পড়ে ছিটিয়ে দিলেন তা মৃতের দেহে। সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। হাজার হাজার লোকের সামনে মৃত ব্রাহ্মণ-তনয় ধীরে ধীরে চোখ মেললে। সবাই বুঝলে মহাপুরুষের যোগ বিভূতির বলে মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে।

মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চার করেই সন্ন্যাসী মেলার ভীড়ে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

এবার সবার মনেই কৌতূহল, সবার মুখেই প্রশ্ন কে এই অলৌকিক-শক্তিধর সন্ন্যাসী? কয়েকজন সিদ্ধ মহাপুরুষ চিনতেন সন্ন্যাসীকে, তাঁরা বললেন, ইনি হচ্ছেন মহাযোগী ভগীরথ স্বামীর সুযোগ্য শিষ্য গণপতি স্বামী।

* * *

বেশ কয়েক বছর পরের কথা। নানা দুর্গম তীর্থ পরিক্রমা করে স্বামীজী এসেছেন নেপালে। এখানকার এক গভীর অরণ্যে আস্তানা নিয়েছেন তিনি।

নেপালের এক রাণা সেদিন শিকারে বেরিয়ে সদলবলে সেই বনের মাঝে ঢুকেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা বাঘের সন্ধান পেয়ে তাকে গুলি করলেন রাণা। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'ল। আবার গুলি করলেন, সেবারও তাই। জিদ চেপে যাওয়ায় অনুচরদের পিছনে ফেলে পলায়মান বাঘের পিছনে ছুটলেন রাণা সাহেব। বাঘ পেলে আবার গুলি করবেন। বাঘ দ্রুত তাঁর আগে ছুটেছে। কিছুক্ষণ পরেই তিনি সেই বাঘের দেখা পেলেন বটে, কিন্তু যে অবস্থায় পেলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। দেখলেন বিশালকায় এক যোগী এক বৃক্ষতলে বসে রয়েছেন আর সেই বাঘটি গর্জন করতে করতে তাঁর পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ল। যোগীবর আদর করে তার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগলেন, দেখে মনে হ'তে লাগল তিনি যেন একটা বড় পোষা বেড়ালের গায়ে হাত বুলাচ্ছেন।

রাণার অনুচরেরাও এর মাঝে তাঁর কাছে এসে গেছে। তারা রাণার সঙ্গে দূরে দাঁড়িয়েই এই তাজ্জব ব্যাপার দেখতে লাগল, ভয়ে কেউই আর এগুতে সাহস পাচ্ছে না। যোগীবর হস্ত সঞ্চালনে অভয় দিয়ে রাণাকে কাছে ডাকলেন। রাণা অভয় পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই স্বামীজী বললেন, দেখো বেটা, ইহা কোই ডরকা কারণ নেহি হৈ। তেরা মনসে হিংসা হটা দো, ইয়ে শের তুমকো কুছ বিগাড়নে নেহি সকেগা। সবকোই জীব তো একহি ভগবানকো সৃষ্টি হৈ, উসকি প্রেম দো, উয়ো ভি তুমকো প্রেম দেগা।

—জরুর। ইয়ে বাত ঠিকসে ইয়াদ রাখনা।

রাণাসাহেব সেদিন শিকার থেকে ফিরে এসে এই অদ্ভুত ব্যাপার নেপালের প্রধান মন্ত্রীর কাছে বিবৃত করেন। লোক মুখে স্বামীজীর এই অলৌকিক শক্তির কথা প্রচারিত হবার ফলে অরণ্য মধ্যে বহু লোক সমাগম হতে থাকে। বাধ্য হয়ে স্বামীজী সে বনাঞ্চল ত্যাগ করেন।

* * *

শোক তাপ ব্যাধি জর্জরিত কত লোকের যে দুঃখমোচন করেছেন এ মহাপুরুষ তার লেখাযোখা নাই। নেপাল ত্যাগের পর তিব্বত আর মানসসরোবর ঘুরে নীচে নামছিলেন স্বামীজী। পথে একদিন দেখলেন গ্রামবাসীর প্রকাণ্ড ভিড়। একটি বিধবা স্ত্রীলোক তার সাত বৎসরের ছেলের মৃতদেহ কোলে করে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছে। এই বালকটিই ছিল তার একমাত্র সম্বল, নয়নের মণি। তাই বুকে শোকসাগর উথল উঠেছে। কারো সান্ত্বনাই সে মানতে পারছে না।

চিতা সাজানো হয়েছে, এবার শব তাতে তোলা হবে। মায়ের কান্নার বেগ আরও বেড়ে উঠল। এমন সময় স্বামীজী ধীর-পদক্ষেপে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তেজঃপুঞ্জ কলেবর এই বিরাটকায় সন্ন্যাসীকে হঠাৎ সামনে দেখেই শোকাতুরা বিধবার মনে হ'ল তার বালকপুত্রকে বাঁচানোর

জন্যই কি এ মহাপুরুষের আবির্ভাব? ইনি কি দৈবপ্রেরিত? বিধবা সম্মোহিতের মত মৃত পুত্রটিকে কোল থেকে নামিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে শুইয়ে দিলেন: বাবা, কৃপা করুন।

মায়ের ক্রন্দন ও মিনতিতে সন্ন্যাসীর চোখে তখন জল এসে গেছে। স্নিগ্ধ নয়নে তিনি মৃত বালকটির দিকে একবার চাইলেন তারপর পরম স্নেহে তার দেহে একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বালকের দেহে আবার প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল।

মৃত বালক সঞ্জীবিত হয়ে ওঠায় তার মা এবং আত্মীয়স্বজন যখন আনন্দে আত্মহারা, সেই ফাঁকে স্বামীজী সেখান থেকে সরে পড়লেন। এরপর যখন তাঁর খোঁজ পড়ল তখন তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

* * *

নর্মদা তীরে।

উত্তরা খণ্ড থেকে নেমে ত্রৈলঙ্গস্বামী নর্মদা তীরে এসে উপস্থিত হন। এই পুণ্যতোয়া নদীর তীরেই পুরাণবিশ্রুত মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম। সেখানে তখন কয়েকজন বিশিষ্ট সাধু তপস্যা করছিলেন। আশ্রমের এক কোণে ত্রৈলঙ্গ মহারাজও নিজের আসন করে নিলেন।

খাকীবাবা নামে এক মহাত্মা বহুদিন যাবৎ এখানে অবস্থান করছিলেন। এ অঞ্চলে তাঁর যোগবিভূতীরও প্রভূত খ্যাতি। একদিন রাত্রি শেষে খাকীবাবা নর্মদাতীরে বসে সাধন ক্রিয়ায় রত এমন সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল নর্মদার জলধারা শুভ্র দুগ্ধধারায় রূপান্তরিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে এই নবাগত ত্রৈলঙ্গ স্বামী অঞ্জলি ভরে সেই দুধ পান করছেন।

খাকীবাবা বুঝলেন কোন এক আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে এই নবাগত মহাপুরুষের নর্মদামায়ের স্তনধারা পান করবার অভিলাষ জেগেছিল মনে, তাই নর্মদা বক্ষে এই অভাবনীয় পীযূষধারা।

খাকীবাবার মনেও এই দিব্য পীযূষধারা পানের আকাঙ্ক্ষা জাগায় তিনিও এগিয়ে গেলেন তা পান করতে। কিন্তু আশ্চর্য

কাণ্ড তিনি তা স্পর্শ করামাত্র নদীর জল পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হ'ল। মার্কণ্ডেয় আশ্রমের সাধুসন্তেরা সবাই ত্রৈলঙ্গস্বামীকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন, তাঁরা খাকীবাবার মুখে এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনে বুঝলেন নবাগত এই যোগী সাধনার সুউচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছেন।

নর্মদাতটের এই আশ্রমে পুরো আট বৎসর কাটিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রয়াগে এসে হাজির হন।

* * *

প্রয়াগে।

ত্রিবেণী সঙ্গমের ঘাটে বসে আছেন স্বামীজী। গ্রীষ্মকাল। আকাশে আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাষ: ঘনমেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আশেপাশে লোকজন বড় কেউই নেই।

রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ স্বামীজীকে বড় ভক্তি করতেন। তিনি স্বামীজীকে আকাশের এই অবস্থায় ত্রিবেণীর ঘাটে এমনি একা বসে থাকতে দেখে বড় দুশ্চিন্তায় পড়লেন, কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, বাবা, এখনই ঝড় উঠেছে, আপনি মিছিমিছি কেন কষ্ট পাবেন, কাছেই লোকের বসতি আছে, সেখানে চলুন।

স্বামীজী প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, মেরা লিয়ে ফিকির মৎ কর, মেরা কোই কস্ট্ নেহি হোগা। লেকিন উহে নাওকো যাত্রীয়োঁকো তা রক্ষা করনে পড়েগা।

স্বামীজীর অঙ্গুলি সংকেতে রামতারণ দেখলেন দূরে একটি যাত্রীবাহী নৌকা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর মধ্যে দুলছে। নৌকাটা সঙ্গম ঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। দেখতে না দেখতে নৌকাটা ঝড়ের বেগ সহ্য করতে না পেরে নদীর মাঝে তলিয়ে গেল।

এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রামতারণ আর্তনাদ করে উঠে স্বামীজীর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখেন স্বামীজী সেখানে নেই আশ্চর্য এর মাঝে কোথায় গেলেন তিনি?

একটু পরেই নদীর দিকে চেয়ে তিনি একেবারে হতবুদ্ধি! নিমজ্জিত নৌকা কোন ইন্দ্রজাল-বলে আবার ভেসে উঠেছে।

এরপর আরোহীদের নিয়ে নৌকাটি যখন তীরে এসে লাগল তখন ব্যাপার দেখে ভট্টাচার্য মশায় ত একেবারে 'থ', দেখলেন আরোহীদের সঙ্গে স্বামীজীও সেই নৌকা থেকে নামছেন। মাঝি মাল্লা আরোহীরা কেউই জানেন না সন্ন্যাসী বাবা কোত্থেকে কখন এসে নৌকোয় চড়েছেন, কি করে তাদের ডুবো নৌকো আবার ভেসে উঠল।

*   *   *

১১৪৪ সালের মাঘ মাস: প্রচণ্ড শীত, তার মাঝে এক প্রত্যুষে অসিঘাটে মহাকায় এক উলঙ্গ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটল। তৈলঙ্গ দেশের লোক বলে স্থানীয় লোক তাঁর নাম রাখল ত্রৈলঙ্গস্বামী। সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর ধরে কাশীর অধিবাসী এবং কাশীতীর্থে আগত পুণ্যার্থীরা তাঁর যোগৈশ্বর্য লীলা দেখে মুগ্ধ হন, ধন্য হন। তাঁর ক্রিয়া কলাপ দেখে লোকে শেষে তাঁকে সচল বিশ্বনাথ আখ্যাও দিয়েছিল।

এখানে এসে প্রথমে তিনি তুলসীদাসের বাগানে বাস করতেন। আপনভোলা মহাপুরুষ একদিন গোলার্ককুণ্ডের সামনে এসে দেখলেন একটি লোক অসহ্য রোগযন্ত্রণায় কাঁদছে। দারুণ কুষ্ঠরোগে দেহ তার বিকল পঙ্গু। রোগীর কাতর ক্রন্দন মহাত্মার অন্তরে করুণা জাগিয়ে তুলল। লোকটির নাম ব্রহ্মসিংহ, বাড়ী আজমীড়ে। তার যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়ে স্বামীজী লোকটির একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখামাত্র ব্রহ্মসিংহের রোগযন্ত্রণা যেন কর্পূরের মত উবে গেল। শিবোপম মহাপুরুষের স্তুতির জন্য তার কণ্ঠ থেকে এমনি শিবস্তোত্র নিঃসৃত হতে লাগল।

রোগীর মুখে শিবের স্তব শুনে স্বামীজীর মুখে এক দিব্য মধুর প্রসন্ন হাসি দেখা দিল। তিনি সস্নেহে ব্রহ্মসিংহের সামনে একটি বিল্বপত্র তুলে ধরে বললেন, কোন চিন্তা নেই তোমার, তুমি এখনই গোলার্ককুণ্ডে স্নান করে এসে এই বেলের পাতাটি মাথায় রাখ, অচিরে তোমার রোগমুক্তি হবে।

স্বামীজীর আশীর্বাদে ব্রহ্মসিংহ তার কঠিন উৎকট ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করে স্বামীজীর পরম ভক্ত হয়ে কাশীতে দিন কাটাতে থাকেন।

স্বামীজী কিছুদিন কাশীতে কাটানোর পরই কারো আর জানতে বাকী রইল না যে ইনি একজন মহাশক্তিধর মহাপুরুষ। অসাধারণ এর যোগবিভূতি। রাস্তায় বেরুলেই তাঁর পিছনে ভক্ত আর আধিব্যাধিক্লিস্ট লোকের ভিড়। মহাযোগীর প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে তাই তাঁর গঙ্গামাঈ। গঙ্গার যে কোন ঘাটে এসে তিনি ধ্যানস্থ হন, আর সেখানে লোকের ভিড় শুরু হ'লেই দুই হাত বাড়িয়ে গঙ্গামায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতিকায় দেহটি নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে জলবিহার। তীরের লোক সব তাকিয়ে থাকে।

স্বামীজীর শিষ্য উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গুরুর গঙ্গাবিহারের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"...উভয়ে স্নান করিবার জন্য জলে নামিলাম। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন। তাহার পর অঙ্গ সঞ্চালন না করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জলে মগ্ন হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইলেন আর দেখিতে পাইলাম না। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমার নিকটেই ভাসিয়া উঠিলেন। পরে জল হইতে উঠিয়া সিঁড়ির উপর উপবেশন করিলে আমি তাঁহার অঙ্গ মুছাইয়া দিলাম এবং উভয়ে আশ্রমে গমন করিলাম।"

গঙ্গার প্রতি তাঁর এমন অনুরাগ দেখে লোকে বলত, গঙ্গাপুত্র ভীষ্মই হয়ত এ যুগে এই মহাযোগী হয়ে মর্ত্যে অবতরণ করেছেন।

* * *

উজ্জয়িনীর মহারাজা এসেছেন কাশীতে। একদিন ব্যাসকাশী ও রামনগর পরিদর্শনের পর নৌকা করে তিনি এপারে আসছেন এমন সময় দেখেন গঙ্গাস্রোতে এক বিশালকায় পুরুষ ভাসছেন।

আরোহীদের মধ্যে অনেকে স্বামীজীকে চিনতেন। তাঁরা রাজাসাহেবের কাছে এই যোগীর পরিচয় দিলেন। একটু পরেই দেখা গেল খেয়ালী মহাযোগী সাঁতরে নৌকার দিকেই এগিয়ে আসছেন। একেবারে কাছাকাছি এসে পড়লে লোকজন তাঁকে সসম্ভ্রমে ধরাধরি করে নৌকায় তুলে নিল।

মহারাজা এবং অন্যান্য আরোহীরা তাঁকে প্রণাম করলেন। সবাই কৌতূহলী হয়ে মৌনী যোগীবরের দিকে চেয়ে রয়েছেন এমন সময় যোগীবর এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। মহারাজার কোমরে একখানা তলোয়ার ঝুলানো ছিল তিনি সেখানা চেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ শিশুর মত নাড়াচাড়া করলেন তারপর হঠাৎ সেটা গঙ্গাগর্ভে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এতে মহারাজার সঙ্গীদের সন্ত্রস্ত হতে দেখে তিনি বালকের ন্যায় খলখল করে হাসতে লাগলেন,—এ যেন এক মজার খেলা।

মহারাজা কিন্তু ব্যাপারটাতে ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ না হয়ে পারলেন না। তলোয়ারটার বিশেষ একটা মূল্য ছিল তাঁর কাছে : এটা তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছিলেন তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে। তাই এটা হারিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উন্মাদ সন্ন্যাসীকে কঠোর শাস্তি দেবেন বলে তর্জন গর্জন শুরু করলেন। স্বামীজী তাঁর রাগ দেখে আরও হাসতে লাগলেন, মহারাজার ক্রোধ এতে আরও বেড়ে গেল।

ঐ নৌকায় কাশীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, তাঁরা স্বামীজীকে বিশেষ ভক্তি করেন, শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। তাঁরা মহারাজকে বলতে লাগলেন, আপনি এত অধীর হবেন না, ডুবুরী সাহায্যে আপনার এ বস্তু আমরা তুলবার ব্যবস্থা করব। স্বামীজী এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ, একটু খেয়ালী হ'লেও এঁর দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হতে আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি। আপনি উত্তলা হবেন না।

নৌকা এসে এ পারে কাশীর ঘাটে লাগল। মহারাজার রা

তখনও যায়নি, তিনি আস্ফালন করতে লাগলেন,—এ হঠকারী নগ্ন সন্ন্যাসীকে তিনি শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।

মহাত্মা এতক্ষণ নীরবে বসে কেবল মহারাজার কথা শুনছিলেন। এবার মুচকি হেসে হঠাৎ গঙ্গার জলে হাত ডুবালেন। সকলে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলেন হাত যখন জলের উপরে উঠে এসেছে তখন তাঁর হাতে রয়েছে ঠিক মহারাজার তরবারির মতই দুখানা ঝকঝকে তলোয়ার। কি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

স্বামীজী এবার মহারাজকে তাঁর নিজের তলোয়ারটা চিনে নিতে ইঙ্গিত করতে লাগলেন, আর মহারাজ দেখলেন দুটিই হুবহু এক রকম দেখতে, এর কোনটি তাঁর বুঝতে না পেরে তিনি শুধু হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

স্বামীজী এবার তাঁর মৌন ভঙ্গ করে মহারাজাকে তিরস্কার করে বললেন, মূর্খ,—যে জিনিস তুমি নিজের জিনিস বলে দাবী করছ, তা তুমি নিজে চিনে নিতে পারলে না। আমি দেখছি তোমার অন্তরে রয়েছে শুধু মোহ আর অজ্ঞান। নিজস্ব বলে কাকে ?—ইহকাল পরকালে যা নিত্য সঙ্গী। মৃত্যুর পর এ তলোয়ার তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে ? পারবে না। তাহ'লে ?—যা তুমি সঙ্গে নিতে পারবে না, ফেলে যেতে হবে, তাকে তুমি নিজের বলো কি করে ? আর যে জিনিস তোমার নিজের নয় তার জন্যে এত ক্ষোভ, ক্রোধ করাই বা কেন ?

স্তম্ভিত মহারাজার সামনে তাঁর নিজের তলোয়ারটি রেখে দিয়ে অপরটি স্বামীজী গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করলেন।

*   *   *

গঙ্গার ঘাটের সামনে দিয়ে স্বামীজী চলেছেন—এমন সময় সামনে পড়ল এক মর্মভেদী দৃশ্য। মৃত স্বামীকে জড়িয়ে ধরে এক সদ্য বিধবা—পাগলিনীর মত চীৎকার করে কাঁদছে।

আগের রাত্রে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেছে স্বামী। কারো সর্পাঘাতে মৃত্যু হ'লে তাকে দাহ না করে জলে ভাসিয়ে দেওয়াই

প্রথা, তাই মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে গঙ্গায় ফেলতে এসেছে। কিন্তু তরুণীর এ নিদারুণ অবস্থা দেখে তার স্বামীর মৃতদেহ জলে ফেলতে পারছে না।

মানুষের প্রতি স্বামীজীর দরদের অন্ত নেই। বিধবা তরুণীর মর্মভেদী ক্রন্দনে আর স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। নদীতীর থেকে কিছুটা গঙ্গামৃত্তিকা এনে মৃতের ক্ষতস্থানে লেপন করে স্বামীজী তখনই গঙ্গা গর্ভে ঝাঁপ দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল মৃত লোকটি চোখ মেলে চাইছে, চেতনা ফিরে এসেছে তার, নিজের এ রকম বন্ধনদশা দেখে সে যেন বিস্মিত হচ্ছে। লোকটির আশেপাশে এবার লোকের দারুণ ভিড় জমে গেল। এতক্ষণ কৌতূহলী হয়ে সবাই যোগীবরের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিলেন, এবার মৃতদেহের প্রাণ সঞ্চারিত হতে দেখে জনতার মাঝে আনন্দের কলরব পড়ে গেল। গঙ্গার বুকে ভাসমান স্বামীজীর দিকে চেয়ে তারা তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাল।

* * *

রাজকর্মচারী হিসাবে কয়েকজন ইংরেজ তখন বারানসীতে বাস করতেন, কৌতূহলী দর্শক এবং পর্যটক হিসাবেও অনেক সাহেব মেমেরও এখানে আগমন ঘটত। আপন ভোলা স্বামীজী নিজের খেয়ালখুশি মত দিগম্বর হয়েই যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান। ইংরেজদের—এ বড় চোখে লাগে, বিশেষ করে ইংরেজ মহিলা এই নগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখে বড় অস্বস্তিই বোধ করেন। তাঁরা তখন তৎকালীন বারানসী ম্যাজিষ্ট্রেটকে গিয়ে ধরলেন তিনি যাতে স্বামীজীর-এ নগ্ন বিচরণের একটা প্রতিবিধান করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের অনুরোধ রাখতে রাজী হলেন, এটা তাঁর কর্তব্য বলেও তিনি মনে করলেন।

স্বামীজী সেদিন নগ্ন অবস্থায় গঙ্গার ঘাটে আসীন, এমন সময় এক পুলিশ-কর্মচারী এসে বললে, থানায় চলো। স্বামীজী তখন ধ্যানাবিষ্ট, পুলিশের কথার কোন জবাবই দিলেন না। এতে মহা

খাপ্পা হয়ে উঠল পুলিশের লোকটা। বেয়াড়া লোককে কি করে বশে আনতে হয় তা তার জানা। সে সেই কৌশল অবলম্বন করতে অর্থাৎ স্বামীজীকে মারধোর করতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু গঙ্গাতীরে স্বামীজীর অনেক ভক্ত ছিল, তাদের বাধা দানের ফলে সেটি করা আর তার সম্ভব হ'ল না।

অফিসারটি বাধ্য হয়ে থানায় গিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে মৌনী স্বামীজীকে ধরে এক দোলায় করে নিয়ে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করল।

সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এমন অসভ্যের মতন উলঙ্গ হয়ে থাক কেন, আর ঐ অবস্থায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াওই বা কেন?—উত্তর দাও।

কে উত্তর দেবে? তিনি নির্বিকার, এসব কথা যেন তাঁর কানেই ঢোকেনি। আকার ইঙ্গিতে কোন জবাবই মিলল না মৌনী মহাত্মার কাছ থেকে। সাহেব এতে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে হুকুম দিলেন, এই বেয়াদব সন্ন্যাসীকে এখনই হাত কড়া লাগিয়ে হাজতে পোরো।

তারপরই দেখা গেল এক অলৌকিক কাণ্ডঃ এইমাত্র যে সন্ন্যাসীকে হাজতে পোরার হুকুম দেওয়া হ'ল, চারিদিকে প্রহরী, সামনে ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য লোকজন থাকলেও সে সন্ন্যাসী আর সেখানে নেই। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এর মাঝেই তিনি কোথায় উধাও হয়েছেন।

খোঁজ, খোঁজ রব, কোথা গেল সন্ন্যাসী খুঁজে বের করো।

এজলাস কক্ষের ভিতরে বাইরে সন্ন্যাসীকে খুঁজতে পুলিশ কর্মচারীরা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল, কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

এর মাঝে কোথায় গেল সন্ন্যাসী, এত লোকের চোখ এড়িয়ে গেলই বা কেমন করে এই কথা ভেবে সকলে যখন কোন কূল-কিনারা পাচ্ছে না তখন দেখা গেল সন্ন্যাসী আগে যেখানে ছিলেন

সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। উলঙ্গ সন্ন্যাসী উপস্থিত লোকের দিকে চেয়ে মিটিমিটি কৌতুকের হাসি হাসছেন।

ব্যাপার দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ত একেবারে 'থ'। একবার তাঁর মনে হ'ল, এ সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষ ন'ন।

এর মাঝে স্বামীজীকে কোর্টে ধরে নিয়ে গেছে শুনে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত এক উকিল নিয়ে কোর্টে হাজির। তাঁরা এসে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝালেন, ইনি একজন মহাপুরুষ, পার্থিব লোভ মোহ দ্বন্দ্ব সঙ্কোচের বাইরে ইনি। চন্দন বিষ্ঠায় এঁর সমজ্ঞান। নিষ্পাপ শিশুর মতই মন এঁর, তাই বস্ত্র পরিধানেরও কোন আবশ্যকতা বোধ করেন না ইনি। একজন বাঙালী ডেপুটিও এই কথা সমর্থন করে সাহেবকে বোঝাতে লাগলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট এরপর সব কথা শুনে বললেন, বেশ ভাল কথা,—সব কিছুতে যদি এর সমজ্ঞান হয় তবে আমি যে খানা খাই সেই খানা ইনি খান দেখি। এখানে দাঁড়িয়ে এখনই তা খেতে হবে।

সাহেব মনে মনে ভেবে নিয়েছেন হিন্দুদের নিষিদ্ধ আমিষযুক্ত খানা সন্ন্যাসী ত খেতে পারবেনা, দেখাই যাক না কি করে।

যোগীবরকে এবার প্রশ্ন করা হ'ল সাহেবের খানা খেতে তাঁর কোন আপত্তি আছে কি না? মৌনী যোগী এবার তাঁর মৌন ভঙ্গ করে প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমকো খানা ম্যায় খানে সকতা, লেকিন ইসকে পহেলে মেরে খানা তুম্‌কো খানে পড়েগা।

ম্যাজিস্ট্রেট তখনই রাজি হয়ে গেলেন, ভাবলেন হিন্দু সন্ন্যাসীরা ত সাধারণতঃ ফলমূলই খেয়ে থাকে, তা খেতে আর তাঁর বাধা কোথায়? কিন্তু এর ফলে সন্ন্যাসীকে ত তাঁদের নিষিদ্ধ মাংস খাইয়ে জব্দ করা যাবে।

সাহেব রাজী হতেই তাঁর এজলাসের মাঝে মহাযোগী অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসলেন। ঘরভর্তি লোকের মাঝে নিজের হাতের উপর মলত্যাগ করে সাহেবের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, সাহেব, আজ এই হচ্ছে আমার খানা।

দেখে সাহেবের দুই চোখ তখন কপালে উঠল। আর স্বামীজী এই আমার আজকের খানা বলে যে মিথ্যা বলেন নি তার প্রমাণ দেখাতে সেই অদ্ভুত খানা নির্বিকারভাবে গলাধঃকরণ করে ফেললেন। তাঁর যোগ বিভূতি বলে সেই ঘৃণ্য বস্তু তখন এক সুস্বাদু আহার্যে পরিণত হয়েছে। সারা আদালত কক্ষ ভরে উঠেছে তার সুবাসে।

সাহেবের তখন আর বুঝতে বাকী রইল না অপরিমেয় যোগ-বিভূতির অধিকারী এই উলঙ্গ সন্ন্যাসী, অসাধারণ এঁর ক্রিয়াকলাপ। তিনি তখনই এক আদেশ প্রচার করে দিলেন এই সন্ন্যাসী নগ্নাবস্থায় নিজের খুশিমত ঘুরে বেড়াতে পারবেন, এতে কেউ কোন বাধা দিতে পারবে না।

* * *

এই ম্যাজিস্ট্রেট বারাণসী থেকে বদলী হয়ে যাবার পর যিনি এসে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করলেন তিনি দারুণ কড়া লোক। স্বামীজী সেই আগের মতই নগ্নাবস্থায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান। একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে ঐ ভাবে রয়েছেন। এতে সাহেব রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা। তখনই হুকুম দিলেন স্বামীজীকে ধরে এনে হাজতে একেবারে তালা বন্ধ করে রাখতে। কাশীর গণ্যমান্য লোক স্বামীজীর পক্ষাবলম্বন করে কত বোঝালেন, প্রার্থনা করলেন, সাহেব তাতে কর্ণপাত করলেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম মত তাঁকে এনে হাজতে তালা বন্ধ করে রাখা হ'ল।

পরদিন সকালবেলার কথা। ম্যাজিস্ট্রেট হাজত ঘরে এলেন নতুন কয়েদীকে সওয়াল করতে। কিন্তু এ কি! কয়েদী ত হাজত ঘরে নেই! পরক্ষণেই দেখা গেল উলঙ্গ সন্ন্যাসী পরম নিশ্চিন্ত মনে হাজতের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কি করে হতে পারল এটা?

সাহেব তখনই তলব করলেন হাজতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং প্রহরীদের। দেখা গেল তাদের কোন কসুরই নেই। যে ঘরে কয়েদীকে রাখা হয়েছিল তার দরজা আগের মত তালা বন্ধই আছে। সাহেব তাঁর অনুচরদের নিয়ে ঘরের লোহার দরজার তালা, চাবি,

দেয়াল যা কিছু পরীক্ষা করা দরকার মনে করলেন সবকিছুই তন্ন তন্ন করে দেখলেন। সন্ন্যাসীর কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসবার কোন সূত্রই খুঁজে পাওয়া গেল না।

বিরক্ত ক্রুদ্ধ অথচ বিস্মিত ম্যাজিস্ট্রেট তখন স্বামীজীকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, তুমি কি করে হাজতের বাইরে এলে, ঠিক করে বলো?

কেন, ভোরে আমার বাইরে আসবার ইচ্ছা হ'ল, আর অমনি এসে গেলাম, কোন বাধা কোথাও ত পেলাম না।

সাহেব ত শুনে হতবাক্।

কারাকক্ষের মেজে একেবারে জলে জলময়। সেদিকে স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, মেঝেতে অমন জল এল কোত্থেকে?

স্বামীজীর সহজ সরল উত্তর, রাত্রে প্রস্রাব পেয়েছিল দেখলাম তালা বন্ধ, তাই দেখে বাইরে যাবার আর ইচ্ছা হ'ল না, ঐখানেই প্রস্রাব করলাম। রাত্রি শেষে আঁধার ঘরে থাকা আমার পছন্দ হ'ল না, তাই বেরিয়ে খোলা বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

এ শুনে সাহেবের ক্রোধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। তিনি স্বামীজীকে আবার হাজতে পুরে, এবার নিজের হাতে তালা বন্ধ করে নিজের এজলাসে চলে গেলেন। খানিক পরেই দেখলেন আরও অদ্ভুত কাণ্ড। এবার কারাকক্ষ বা কারাকক্ষের বাইরে নয়, তার এজলাস ঘরেরই এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উলঙ্গ সন্ন্যাসী, ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে দুষ্ট বালকের মত কৌতুকের হাসি হাসছেন। এ অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ত একেবারে 'থ'।

যোগীরাজ এবার ধীর পদে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, সাহেব, তোমরা শুধু জড় আর জড়ের শক্তিকেই বোঝ, এর মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এক মহাচৈতন্য-লোক সে খবর তোমাদের জানা নেই। সেই চৈতন্য-লোকের সঙ্গে যার কারবার বাইরের

কোন বাধাই তাকে আটকাতে পারে না। ভারতের যোগীরা এই চৈতন্য-শক্তি লাভ করেন বলে তাঁদের কাছে জগতের কোন কাজই অসাধ্য থাকে না। সুতরাং শুধু শুধু এখানকার সাধুসন্ন্যাসীদের বিরক্ত করে তোমার লাভ কি ? আর তাদের হয়রান করবার শক্তিই বা আছে কই তোমার ?

এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বোধোদয় হ'ল। তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামী সম্বন্ধে এক নতুন আদেশ জারি করলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁর খেয়াল খুশি মত যত্র তত্র ঘুরে বেড়াতে পারবেন, কেউ তাঁকে কোন বাধা দিতে পারবেন না। ভবিষ্যতেও কেউ যাতে এই সন্ন্যাসীর উপদ্রব করতে না পারে সেই মর্মেও এক আদেশ এই সময় তিনি জারি করেন।

যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ

নানা তীর্থ পর্যটন করে ব্রহ্মচারী বেণীপ্রসাদ রামেশ্বর এসে হাজির হয়েছেন। মনে অপার আনন্দ। ভারতের শৈব সাধকদের মহাতীর্থ এই রামেশ্বর। এখানকার দেবাদিদেবের প্রতিক দেখার সাধ তাঁর অনেক দিনের, আজ সে সাধ তাঁর পূর্ণ হ'ল। আরও আনন্দের কথা আজ এক পুণ্য যোগ, দূরদূরান্ত থেকে কাতারে কাতারে এসেছেন পুণ্যার্থী নরনারী।

বেণীপ্রসাদের মন আনন্দে একেবারে ভরপুর। ধূলো পায়েই সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেবদর্শন করে নিলেন, তারপর স্নানতর্পণ সেরে মন্দিরের জগমোহনে গিয়ে বিশ্রামের জন্য বসলেন।

কাল থেকে এক টুকরো ফল বা এক মুষ্টি অন্ন জোটেনি। কারো কাছে খাদ্য চাইবেন না, যা করেন রামেশ্বর—এই ভেবে মন্দিরের দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসলেন। একটু পরেই তন্দ্রা এসে গেল।

হঠাৎ—বেণীপ্রসাদ, বেটা, কাহে চুপচুপ ব্যয়ঠে হ্যায় হো? বহুৎ ভুখ লাগি হৈ না?—গম্ভীর কণ্ঠের এই আওয়াজ শুনে তন্দ্রা কেটে গেল বেণীপ্রসাদের: তাই তো এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে কে তাঁর নাম জানল,—এমন স্নেহমাখা স্বরে তাঁর ক্ষুধা পেয়েছে কি না সে কথা জিজ্ঞাসা করল?

বেশিক্ষণ ভাবতে হ'ল না, প্রায় তখনই এক বিরাটকায় নগ্ন সন্ন্যাসী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, এ যেন এক মৈনাক পর্বত।

ব্যাপার দেখে বেণীপ্রসাদ একেবারে 'থ',—সন্ন্যাসীর চোখেমুখে প্রসন্নতার ছাপ। কমণ্ডলু থেকে দুটো পাকা বেল বের করে বেণীপ্রসাদের হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, বেটা, ইহ্ ফল তো পহলে খা লে।

খিদে পেয়েছে খুবই একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, তা ছাড়া এই বিরাটকায় সন্ন্যাসীর দেওয়া জিনিস প্রত্যাখান করবার সাহসও নেই, তাই বেণীপ্রসাদ হাত পেতে নিলেন সে দুটি ফল। আহার শেষে শুরু হ'ল অন্তরঙ্গ আলাপ। সে আলাপের মর্ম এই—

বেটা, তুই আমায় চিনতে পারিস নি, কিন্তু আমি তোকে ঠিকই চিনেছি। আমি রামেশ্বরে তোর জন্যেই এ কটা দিন অপেক্ষা করছি। কাল তোকে দীক্ষা দেবার পর তবে আমার ছুটি।

বাবা, আমি ত চিনতে পারছিনে আপনাকে। কৃপা করে পরিচয় দিয়ে এ দাসের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

বেণীপ্রসাদ, কনৌজে বাড়ি না তোমার?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এক মহাত্মা তোমাকে তোমার বাবার কাছ থেকে হিমালয়ের তরাইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন,—ঠিক কি না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি তোমার শিক্ষাগুরু,—এতদিন তুমি তাঁরই কাছে ছিলে,—তাই না?

আজ্ঞে।

বিঠোরে তোমার শিক্ষাগুরু দেহত্যাগ করবার সময় তোমায় বলে যান নি,—রামেশ্বরে তুমি তোমার দীক্ষাগুরুর দেখা পাবে, তিনিই তোমায় দীক্ষা দেবেন।—ভেবে দেখ, মনে পড়ে কিনা।

বেণীপ্রসাদের সব মনে পড়ল, সন্ন্যাসীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু কে ইনি,—কে এই ভীমভৈরব-কান্তি মহাপুরুষ?—আমার সম্বন্ধে এত কথা ইনি জানলেনই বা কি করে?

সন্ন্যাসী বেণীপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে মৃদুমধুর হাসছিলেন, এবার তাঁর মনের কৌতূহল নিবৃত্তি করতে বললেন, বেটা, তোমার শিক্ষাগুরু তোমায় আশ্রয় দেবার জন্য আমায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেছেন। কাল খুব ভোরেই শুভলগ্ন আছে। তুমি সমুদ্রে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে থেকো, আমি এসে তোমায় দীক্ষা দেব।

পরদিন ভোরে বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর সামনে বেণীপ্রসাদের দীক্ষাদান হয়ে গেল। দীক্ষার পর নাম হ'ল ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী।

আর যে ভীমকায় সন্ন্যাসী তাঁকে দীক্ষা দিলেন তিনি হচ্ছেন ভারত বিশ্রুত মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামী, উত্তরকালে যিনি কাশীধামের সচল বিশ্বনাথ নামে অভিহিত হন।

* * *

বেণীপ্রসাদকে দীক্ষা দেবার পর ত্রৈলঙ্গস্বামী দুই তিন দিনের মধ্যেই রামেশ্বর ত্যাগ করেন। বিদায় নেবার সময় তিনি ত্রিপুরলিঙ্গকে বলে যান, বেটা, অব্ তুম পরিব্রাজন করতে রহো। চিন্তা মৎ করো। আখেরমে সব তুমকো মিল যায়গা।

গুরুর নির্দেশ মত ত্রিপুরলিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য তীর্থগুলি দর্শনে বেরিয়ে পড়েন।

কিষ্কিন্ধ্যা ও পম্পার পর পুণা, সতারা মুম্বাজী, তারপর আসেন নর্মদা তীরে ত্র্যম্বকেশ্বরে। সাধনার জন্য নর্মদা তীর বড় উপযোগী বলে এইখানে তিনি বেশ কিছুদিন থেকে যান।

পরিব্রাজনের পথে নর্মদা তীরের এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এসে দেখলেন সেখানে বহু দরিদ্র নরনারী এবং সাধুসন্ন্যাসী এসে ভিড়

করেছে। ব্যাপার কি? কৌতূহলী ত্রিপুরলিঙ্গ প্রশ্ন করলেন ওখানকার সমবেত লোকদের।

উত্তরে এক সাধু বললেন, বাবা, আমরা এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য জমায়েত হয়েছি। সময় প্রায় হয়ে এল। আহার্য এখুনি এসে পড়বে। তুমি ইচ্ছে করলে এই পংক্তিতে বসে পড়তে পার।

সাধু এই কথা বলতে না বলতে ত্রিপুরলিঙ্গ দেখলেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য: বনান্তরাল থেকে একদল বাহক সার বেঁধে এগিয়ে আসছে, কাঁধে তাদের ঝুড়ি ভবতি নানা রকমের খাবার।

কোত্থেকে এ সব আসছে কে পাঠাচ্ছেন ত্রিপুরলিঙ্গ এ কথা জিজ্ঞাসা করে জানলেন যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন এক মহাত্মা আছেন এখানে, নাম তাঁর জ্যোতিস্বামী। তিনিই সাধুসন্ত এবং দরিদ্র-নারায়ণ সেবার জন্য রোজ খাবার পাঠান এখানে। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে থাকে পুরি, হালুয়া, মালপোয়া ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে। তাই সবাই আনন্দ করে খায়।

আশ্চর্যের কথা এই যোগী পুরুষ এ সব যোগাড় করেন তাঁর অসামান্য যোগবিভূতির বলে। মহাপুরুষ নর্মদাতীরে একটা বটগাছের নীচে সর্বদা চুপচাপ বসে থাকেন। সম্বলের মধ্যে আছে শুধু তার একটা বড় ভিক্ষার ঝুলি আর একটা চিমটে। ঝুলিটি গাছের ডালে ঝুলানো থাকে। প্রার্থীদের প্রিয় খাদ্যের কথা জেনে নিয়ে মহাত্মা তাঁর ঐ চিমটে দিয়ে ঝুলিটা স্পর্শ করে সে খাদ্যের কথা বললেই তা অমনি ঐ ঝুলির মাঝে এসে যায়। তিনি তখন তা ক্ষুধার্ত নরনারীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

সিদ্ধিবলে সেবা, সাধু সেবা, দরিদ্র সেবা করা তাঁর কাছে যেন একটা খেলা। ছেলেদের যেমন খেলা নিয়ে মেতে উঠতে দেখা যায়, তিনিও তেমনি এতে যেন মেতে ওঠেন।

লোকমুখে জ্যোতিস্বামীর এই সব কথা শুনে ত্রিপুরলিঙ্গ তখনই তাঁকে দর্শন করতে গেলেন। গিয়ে দেখেন অতি বৃদ্ধ অথচ দিব্যকান্তি সুগৌরতনু এক মহাপুরুষ প্রসন্ন হাসিমুখে বটবৃক্ষতলে

উপবিষ্ট। বড়ই প্রাচীন হয়েছে তাঁর দেহ, গাত্র চর্ম লোল হয়ে গেছে, ভুরু ও চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে। মস্তকের দীর্ঘ জটাজাল একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ত্রিপুরলিঙ্গ গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

জ্যোতিস্বামীর কত বয়স হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। ওখানকার অতি বৃদ্ধ সাধুরাও বলেন ছেলেবেলা থেকে তাঁকে তারা এই রকমই দেখছেন। এ বয়সে দৃষ্টিশক্তি কিন্তু তাঁর একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি, পায়ে হেঁটে এখানে ওখানে যেতেও কোন ক্লান্তির লক্ষণ চোখে পড়ে না।

মহাত্মার সামনে বসে ত্রিপুরলিঙ্গ তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন। ভাবছেন কতদিনের সাধনার ফলে সাধক এমন বিভূতি লাভ করতে পারে, এর দ্বারা লোকের কত উপকারই না করতে পারা যায় —তা ছাড়া তাঁর অভীষ্ট লাভই বা কবে হবে। এমন সময় জ্যোতি-স্বামী তাঁর দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুমি কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাও, নর্মদা মাঈর কোল বড় শান্তির।

এই বলতে বলতে জ্যোতিস্বামী তাঁর ঝুলির মাঝে হাত দিলেন, বের করলেন সেখান থেকে অনেকগুলি গরম পুরি আর মালপো। স্মিত হাস্যে ত্রিপুরলিঙ্গের দিকে সেগুলি এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও বেটা, নাও, নর্মদার তীরে বসে এগুলি ভোজন করে এস।

এতটা টাটকা খাবার ঐ ঝোলা থেকে মহাত্মা কি করে বের করলেন সে রহস্য ভেদ করতে না পেরে ত্রিপুরলিঙ্গ জ্যোতিস্বামীর পায়ের কাছে এগিয়ে বসলেন। এ কথা যোগিবরের কাছে তাঁর না জেনে নিলে চলবে না।

জ্যোতিস্বামী তাঁর মনোভাব জানতে পেরে বললেন, বাচ্চা, যোগীদের এ সব সিদ্ধি বা অলৌকিক ব্যাপার দেখে অবাক্ হবার কিছু নেই। সৃষ্টির সূক্ষ্ম স্তরে নিহিত মহাশক্তি থেকে সাধনা বলে মানুষ আহরণ করতে পারে অপরিমেয় অলৌকিক শক্তি। এই তত্ত্বে লোকের বিশ্বাস জন্মাবার জন্যই কোন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ

লোকসমাজে যোগ বিভূতির খেলা দেখিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবার বালকসুলভ কৌতুকের বশেও এ করে থাকেন। সাধক জীবনের আসল বস্তু এতে কিছু নেই।

পওহারী বাবা

গাজীপুরের কাছে কুর্থায় এক মৃত্তিকাগুহা নির্মাণ করেন পওহারী বাবা। সেখানে থেকে সুদীর্ঘকাল যোগসাধনা ধ্যানাদি করেছেন। দীর্ঘকাল সুর্ণালোকহীন গুহায় বাসের ফলে দেহটি হয়ে উঠেছিল তাঁর ফুলের মত কোমল, বর্ণ হয়েছিল তুষারের মত শুভ্র।

ঐ গুহাতে থাকতেই থাকতেই একবার মাঘ মেলা উপলক্ষ্যে প্রয়াগে এসে ত্রিবেণীর তীরে বালুচরে এক পর্ণ কুটির বেঁধে কিছুকাল বাস করে যান তিনি। এতকাল পরে সূর্যতাপ ও বায়ুর সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর দেহের কোমল চর্মে ফোসকা পড়ে, স্থানে স্থানে চর্ম উ... যায়, এ ছাড়া হয় প্রবল জ্বর আর তার সঙ্গে স্বরভঙ্গ। ভক্তেরা সব তাঁর চিকিৎসার জন্য মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু বাবাজী ওষুধ খেতে একেবারেই নারাজ।

শাস্ত্রবিদ কয়েকজন স্থানীয় ব্রাহ্মণ এসে খুব জোর চেপে ধরলে বাবা শেষে ওষুধ খেতে রাজী হ'লেন : এ দাসকে আপনারা কি ওষুধ দিতে চান দিন।

বৈদ্যের ব্যবস্থামত তখনই ওষুধ তৈরী করে আনা হ'ল। বাবাজী তখন হেসে বললেন, বাবা সকল, ওষুধ তো আপনারা দিচ্ছেন, কিন্তু এ দাসকে কিছু পথ্য দেবেন না ?

শুনে পণ্ডিতদের ত আনন্দের সীমা রইল না, তাঁরা জোড় হাত করে বললেন, মহারাজ আপনি মুখ ফুটে পথ্য চাইলেন এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। একটু সবুর করুন, এখনি আমরা সব কিছু ব্যবস্থা করছি।

সকলেই জানেন বাবাজী দীর্ঘকাল সামান্য একটু দুধ এবং বিল্বপত্রের রস পান করে জীবন ধারণ করে আসছেন, তাই সকলের মনেই উল্লাস, আজ তাঁকে সুখাদ্য খাওয়ানোর সুযোগ পেয়ে জীবন সার্থক করা যাবে।

ভক্তেরা থালা ভরতি উৎকৃষ্ট পেঁড়া, বরফি, রাবড়ি ইত্যাদি তাঁর সামনে এনে হাজির করল। বাবা সে সব দেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। ঔষধ পথ্য কিছুই গ্রহণ করলেন না তখন, দুইটি ভাঁড়ে সযত্নে তুলে রেখে বললেন, বাবা সকল, এ দাসের প্রতি আপনাদের দয়ার অন্ত নেই, ভাবছি আজ রাত্রি বেলাতেই এগুলির সংগতি করবো। এখন এগুলি এইভাবেই থাক। এই বলে তিনি অন্য কাজে মন দিলেন।

এ কথায় ভক্তদের কেমন একটু সন্দেহ হ'ল: ইনি কি সত্যি এগুলি গ্রহণ করবেন, না অভিনয়? ফেলে দেবেন হয়তো! যাই হোক লক্ষ্য রাখতে হবে।

নিশীথ রাত আশেপাশে সবাই ঘুমে অচেতন। এমন সময় বাবা ঔষধ ও পথ্যের দুটি ভাঁড় নিয়ে চুপি চুপি গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওখানকার কয়েকজন পণ্ডিত ভক্ত চুপি চুপি তাঁর পিছু পিছু গিয়েছেন। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন বাবা ভাঁড় দুটি গঙ্গা গর্ভে বিসর্জন দিয়ে স্নান করে এসে নিজের কুটীরে ধ্যানাসনে বসলেন।

পরদিন ভোরে ভক্তেরা তাঁকে চেপে ধরলেন: বাবা, এত দৌড় ঝাঁপ করে আমরা ওষুধ আনলাম, পথ্য আনলাম, তার কিছুই ত আপনি খেলেন না, সে সব কি করলেন তা স্বচক্ষে আমরা দেখেছি। এই যদি আপনার মনে ছিল, তা মুখে বললেই ত হ'ত, লেঠা চুকে যেত, আমাদের ছোটাছুটিও করতে হ'ত না, পয়সাও নষ্ট হ'ত না।

বাবা অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, বাবা সকল, আপনারা শুধু শুধু এ দাসের উপর রাগ করছেন। এ দাস কিন্তু সত্যি কোন অপরাধ করেনি। তার রোগের জন্য যে ঔষধ পথ্য আপনারা

যুগিয়েছিলেন তা সে তার রোগকেই দিয়েছে। এই দেখুন শরীরে আমার রোগের চিহ্নমাত্র নেই।

ভক্তেরা সব অবাক হয়ে দেখলেন সত্যিই তার গায়ের সে ফোস্কা ছাল ওঠা সব একেবারে মিলিয়ে গেছে, গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন—জ্বরের উত্তাপও আর নেই।

বিনা চিকিৎসায় এক রাত্রের মধ্যে এ অলৌকিক ব্যাপার যে কি করে ঘটল তা কারোই বোধগম্য হ'ল না।

*　　　*　　　*

পওহারী বাবার তিরোধানের ব্যাপারটাকে ঠিক অলৌকিক আখ্যা দেওয়া যায় কিনা জানি না, তবে তা অসাধারণ যে উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করা সম্ভবপর হ'ল না।

১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। সবে ভোর হয়েছে। আশ্রমের ভক্ত সেবকেরা প্রাতঃস্নানে যাবার আয়োজন করছেন, এমন সময় তাঁদের চোখে পড়ল আশ্রমের যে অংশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে বাবা নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, সেখান থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কোন রকম অসতর্কতায় আগুন লাগেনি ত?

যেখান থেকে ধোয়া বেরুচ্ছে তার পাশেই বাবাজীর ঠাকুর ঘর। চন্দন ঘষা এবং পূজার অন্য আয়োজনের আওয়াজও কানে আসছে। বাবাজী মহারাজ হয়ত তাঁর সঙ্কল্পিত পূজার আয়োজনে ব্যস্ত।

ক্রমে ধোঁয়া আরও বেশি বেরুতে লাগল, চারিদিকে তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাই দেখে আশ্রমের অধিবাসীরা আঙিনায় এসে জড়ো হ'লেন। খবরটা গ্রামের লোকের কাছে পৌঁছোলে সেখান থেকেও বহু ভক্ত ছুটে এলেন। সকলের চোখে মুখেই আতঙ্কের ছায়া। বাবার হোমের ধোঁয়া বলে এ মনে হ'ল না। তবে? ভিতরে নিশ্চয়ই কোন অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছে।

বাবার অনুমতি ছাড়া আশ্রমের ভিতরে ঢুকবার কারো অধিকার নেই, তাই সাহস পাচ্ছে না কেউ ঢুকতে।

বাবাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র বদরীপ্রসাদ বাবার সেবকও বটে। তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে পাশের ঘরের ছাদে উঠে নীচের দিকে চাইলেন। এ কি! সারা পূজার ঘর জুড়ে যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দেখে আশঙ্কায় বুক কাঁপতে লাগল তাঁর। এ সময় বাবাজী মহারাজ কোথায়, অগ্নিকুণ্ডের মাঝে পড়েননি ত?

আর চুপ করে থাকতে না পেরে চীৎকার করে উঠালেন বদরী-প্রসাদ, মহারাজ, আপনি কোথায়? আগুনের মাঝে পড়েননি ত? কৃপা করে আমাদের একবার ভিতরে ঢুকবার অনুমতি দিন, এ আগুন আমরা এখনই নিভিয়ে ফেলি।

কোন সাড়া মিলল না। বদরীপ্রসাদ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পায়চারি করতে লাগালেন, কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

হঠাৎ ভিতরের দিকে নজর পড়াতেই দেখেন বাবা এবার ধীর পদক্ষেপে আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। সদ্যস্নাত বাবার লম্বা চুলগুলি তাঁর পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। যে আলখেল্লা দিয়ে সবসময় তিনি তাঁর দেহ আবৃত করে রাখেন সেটা খুলে কাঁধে রেখেছেন। কোমরে জড়ানো কুশরজ্জুতে বাঁধা শুধু একফালি কৌপীন। আগুনের আভায় উদ্ভাসিত তার মূর্তি। সারা গায়ে ঘি মাখানো।

কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, এবার লেলিহান অগ্নি শিখার কাছে এগিয়ে এলেন। আরও এগুতে যাচ্ছেন দেখে বদরীপ্রসাদ আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। মাত্র একবারের জন্য তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে মহাপুরুষ সেই জ্বলন্ত ঘরে প্রবেশ করলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শুনে ভক্ত গগন চন্দ্র রায় এই দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"পওহারী বাবা হোমকুণ্ডের সম্মুখে কম্বলের আসনে উত্তর মুখ হইয়া পদ্মাসন যোগে মগ্ন আছেন ও তাঁহার পবিত্র দেহ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতেছে। হস্তের অবলম্বন 'আশা', কাষ্ঠের গেদণ্ড নিকটে স্থাপিত রহিয়াছে। চতুর্দিকে ঘৃতের কলস ভাণ্ড, কর্পূর ধূনা এবং

নানাবিধ হোমের দ্রব্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে। ভক্ত ভৃগুনাথ এই দৃশ্য দেখিবা মাত্র অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন আরও অন্যান্য লোক সকল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে মহাযোগীর ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া গেল। পুরাকালের শরভঙ্গ ঋষি প্রভৃতির ন্যায় সাধনান্তে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া স্বকৃত হোমাগ্নিতে দেহ বিসর্জন পূর্বক মহাযোগী মহাধামে চলিয়া গেলেন।"

লালাবাবু

লালাবাবু। আসল নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। ইতিহাস-খ্যাত পুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র, বেলা শেষে শিবিকারোহণে গৃহে প্রত্যাবর্তন পথে রজকদুহিতার মুখে 'বাবা, বেলা, যায়, বাসনায় আগুন দাও' শুনে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় অতুল ধনৈশ্বর্য ছেড়ে যিনি বৃন্দাবনবাসী হয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তিনি শুধু বৃন্দাবনে নয়, ভারতের যে যে স্থান কৃষ্ণলীলাভূমি বলে চিহ্নিত সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিগ্রহ সেবা এবং অতিথি সেবার জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা করেও যিনি নিজে সৎ বৈষ্ণবের মত দীনহীন ভিখারী সেজে মাধুকরী করে দিন যাপন করতেন—তাঁরই জীবনের কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা।

বৃন্দাবনে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মন্দির, তাতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। তাঁর সামনে তিনি আকুল প্রার্থনা জানান, ঠাকুর তুমি ত নিত্যজাগ্রত। নিত্যলীলাময়, এ লীলা অধমকে একবার দেখাও। জাগ্রত হয়ে আত্মপ্রকাশ না করলে আমি ছাড়ছি না।

লালাবাবুর হৃদয় থেকে গভীর আকুতি মিশে দিনের পর দিন চলে এ প্রার্থনা। তারপর একদিন—

মাঘ মাস তখন। বৃন্দাবনে শীত পড়েছে খুব। সকাল থেকেই মন্দিরে ষোড়শোপচারে ঠাকুরের সেবা পূজা চলছে। মন্দিরের এক

কোণে দাঁড়িয়ে লালাবাবু দেখছেন। ভাবাবেশে নয়নে অশ্রু, দেহ কণ্টকিত। হঠাৎ অদ্ভুত এক খেয়াল চাপল তাঁর মনে। নিষ্ঠাভরে মন্ত্রাদি পাঠ করে পূজারী ত বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনিও ঠাকুরকে জাগাবার জন্য কত প্রার্থনা করেছে, দেখা যাক ঠাকুরের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে কি না। ভোগের উপকরণ থেকে হঠাৎ একতাল মাখন তুলে নিলেন লালাবাবু, নিয়ে পূজারীর হাতে দিয়ে বললেন, এই মাখনটুকু শ্রীমূর্তির মাথায় ঠিক তালুর উপরে বসিয়ে দিন ত। আমার ঠাকুর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন কিনা, আমার সেবা পূজা সার্থক হয়েছে কি না তা একবার পরখ করে দেখতে চাই।

শুনে পূজারী ত অবাক: বাবু কি প্রকৃতিস্থ নেই আজ—না ভাবের ঘোরে এই প্রস্তাব করছেন? পূজারী অতি সসংকোচে বললে, আপনি যখন আদেশ করছেন তখন নিশ্চয়ই আমি পালন করব, কিন্তু এ ধরণের পরীক্ষা কেউ কোনদিন করেছেন বলে আমরা জানি না, শুনিওনি কোনদিন।

পূজারী ঠাকুর, বিগ্রহ যদি চৈতন্যময় হয়েই থাকেন, তবে তাঁর দেহেও কেন থাকবে না চৈতন্যের লক্ষণ? কেনই বা থাকবে না তাতে উত্তাপ আর প্রাণের স্পন্দন?

এ কথার আর কি উত্তর দেবে পূজারী? আর বাক্যব্যয় বৃথা মনে করে পূজারী তখন মাখনের তালটি নিয়ে গিয়ে বিগ্রহের মাথায় রাখলে। এরপর পূজার্চনা আগের মতই চলতে লাগল।

এরপর যা ঘটতে দেখা গেল তা দেখে ত উপস্থিত সকলে একেবারে 'থ'। দেখা গেল বিগ্রহের মাথায় রাখা মাখন ধীরে ধীরে গলে ঝরে পড়ছে, সারা গা একেবারে মাখনলিপ্ত।

সকলেই বুঝলেন এ প্রচণ্ড শীতে স্বাভাবিকভাবে মাখন গলে ঝরে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক কারণে বিগ্রহের ব্রহ্মতালু উষ্ণ হয়ে উঠেছে, নইলে এমন ব্যাপার কখনও ঘটতে পারে না।

দর্শকেরা এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, ভক্ত লালাবাবু ভাবাবেগে কাঁপতে কাঁপতে মন্দিরের মেঝেতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

আর একদিনের কথা। সেদিন লালাবাবুর মাথায় আবার এক নতুন ঝোঁক চাপল। তাঁর মনে হ'ল বিগ্রহের ব্রহ্মতালুতে যদি উত্তাপের সঞ্চার হয়ে থাকে, তবে নাকেই বা নিঃশ্বাস বইবে না কেন? দেখাই যাক না একবার পরীক্ষা করে।

মন্দিরের সেবকদের কিছুটা তুলো আনতে বললেন তিনি। আনা হ'লে তিনি পূজারীকে বললেন, এর খানিকটা আপনি কিছুক্ষণ শ্রীমূর্তির নাকের কাছে ধরে থাকুন ত, দেখি তাঁর নিঃশ্বাস পড়ছে কি না।

পূজারী মৃদু হেসে বললে, সেদিন ত ঠাকুরের মাথার তাপে মাখন গলিয়ে দেখলেন, আবার এ কেন?

অনেকদিন বিষয় নিয়ে দিন কেটেছে, বিষয়ী মন, তাই সংশয় যেতে চায় না, ঠাকুর আরও কৃপা করলে যাবে। আপনি ধরুন না একবার বস্তুটা শ্রীমূর্তির নাকের কাছে।

লালাবাবুর কথা মত পূজারী ধরলে কিছুটা তুলো বিগ্রহের নাকের নীচে। সবাই অবাক্ বিস্ময়ে দেখলে বিগ্রহের নাসারন্ধ্র নির্গত নিঃশ্বাসে পূজারীর হাতের তুলো ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে।

লালাবাবুর এবার উল্লাসের সীমা নেই। প্রেমোন্মত্ত হয়ে তিনি শ্রীমূর্তির সামনে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

* * *

আর একদিনের ঘটনা। এ আরও অলৌকিক, আরও বিস্ময়কর।

লালাবাবু বৃন্দাবন ছেড়ে গিরি গোবর্ধনে এসেছেন। নিজে ইচ্ছে করে নয়, স্বপ্নে ইষ্টদেবের নির্দেশ পেয়ে। এখানে এসে ভজন এবং কৃচ্ছ্রসাধনে দিন কাটে। ভোরে উঠেই প্রথম কাজ হ'ল গিরি গোবর্ধন পরিক্রমা, তারপর বসে জপ ধ্যান ভজন। দেহরক্ষার জন্য একবার শুধু মাধুকরীতে বেরোন।

ভীষণ বর্ষা নেমেছে গোবর্ধনে। সকালে গোবর্ধন পরিক্রমার পরই লালাবাবুর মনে হঠাৎ অভিলাষ জাগল আজ শ্রীবিগ্রহের বৈকালিক ভোগপ্রসাদ পেতে হবে। মাধুকরীতে বেরোবার যখন প্রয়োজন হবে না তখন দিনটা নাম জপ আর ভজনানন্দে কাটানো যাবে।

পরিক্রমা শেষ করেই পূজারীকে জানিয়ে গেলেন প্রভুজীর প্রসাদ যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেদিন মন্দিরে আরতি ভোগের পর শুরু হ'ল দারুণ দুর্যোগ। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে মন্দির থেকে কারো বেরুবার উপায় রইল না। পূজারী পড়ল মহাসঙ্কটে। ভক্ত লালাবাবু সেই কখন থেকে ঠাকুরের প্রসাদের আশায় বসে আছেন। কিন্তু এই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মাঝে ভোগপ্রসাদ কে তাঁর ভজন গোফায় পোঁছে দেবে। কোন উপায় নেই।

অনেক রাত্রে ঝড় জলের প্রকোপ যখন একটু কমল পূজারী তখন আর বিলম্ব না করে প্রসাদ নিতে ঠাকুর ঘরে ঢুকল। কিন্তু এ কি! ভোগ নিবেদনের পর লালাবাবুর জন্য যে প্রসাদের থালা সে বিগ্রহের সামনে রেখে গিয়েছিল তা ত সেখানে নেই। কে সরালো থালা এখান থেকে? রাত্রে পূজারী ত একাই থাকে এ মন্দিরে। এ দুর্যোগে এ নির্জন গিরি শিখরে আর কারো ত আসবার কথা নয়। মহা বিপদে পড়ল পূজারী, সমস্যায়ও বটে: লালাবাবুকে ত আর অভুক্ত রাখা যায় না।

পূজারী তখন প্রসাদী ফলমূল যা অবশিষ্ট ছিল তাই একত্র করে একটা নতুন মাটির ভাঁড়ে সাজিয়ে তাই নিয়ে হাজির হ'ল লালাবাবুর ভজন গোফায়। নিতান্ত অপরাধীর মত বললে, ঝড় জলের জন্যে—

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে লালাবাবু বলে উঠলেন, সে কি পূজারী ঠাকুর, এই যে কিছু আগে দিয়ে গেলেন আমায় থালা ভরতি প্রভুজীর ভোগপ্রসাদ, আবার এসব কেন?

: সে কি, বাবুজী, আপনার জন্যে প্রভুজীর ভোগপ্রসাদ আনব

বলে কখন সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি, কিন্তু কি করব বলুন, এই দারুণ দুর্যোগে কিছুতেই ঘরের বার হতে পারলাম না।

লালাবাবু তখন গোফার এক কোণ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, চেয়ে দেখুন ঠাকুরের প্রসাদী থালা এখনো পড়ে রয়েছে। আপনি নিজে হাতে ভোগপ্রসাদ দিয়ে বলে গেলেন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে এর মাঝেই সব ভুলে যাব?

পূজারী তখন সাশ্রুনয়নে করজোড়ে বললে, বাবুজী, আমি প্রভুজীর নামে শপথ নিয়ে বলছি, এর আগে আজ আমি মন্দির থেকে বেরুই নি, এই সবে বেরুলাম। তা ছাড়া প্রভুজীর ভোগপ্রসাদের থালা খুঁজে না পেয়ে আপনি না খেয়ে থাকবেন বলে বাধ্য হয়ে শেষে এই মাটির ভাঁড়ে এই ফলমূল সাজিয়ে এনেছি।

পূজারীর মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লালাবাবুর দুই চোখ দিয়ে প্রথমে জল ঝরে পড়তে লাগল, দেহের রোম সব খাড়া হয়ে উঠল, কাঁপতে কাঁপতে শেষে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর সে কি আকুতি: হায় প্রভু, অধমকে এমনি ছলনা করে গেলে তুমি? পূজারীর ছদ্মবেশে নিজে হাতে আমার জন্যে তোমার ভোগপ্রসাদ বয়ে আনলে। আমি মোহাচ্ছন্ন অন্ধ, তাই তোমায় চিনতে পারলাম না। নিজ রূপে একবার সামনে এসে দাঁড়াও, দয়াল, এ অভাগার জীবন সার্থক হোক।

নামদেব

মহারাষ্ট্রের সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক নামদেব। বাংলাদেশের পদকীর্তন বস্তুতঃ ভক্তিরসাত্মক হলেও তাতে যেমন কাহিনী আছে মহারাষ্ট্রের অভঙেও আছে তেমন কাহিনী। নামদেব নিজে অনেক অভঙ

রচনা করেছেন, আর করেছেন তাঁরই উপযুক্ত শিষ্যা জনাবাঈ। জনাবাঈ তার একটা অভঙে তাঁর গুরুর এক অলৌকিক কাহিনী পরিবেশন করে গেছেন। কাহিনীটি ছোট্ট হ'লেও বিস্ময়কর। মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামের নাম পন্ধারপুর, সেখানে বিঠ্‌ঠলজীর মন্দির। একবারকার প্রবল বন্যায় নামদেব কি করে এই মন্দিরটা রক্ষা করলেন তারই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন জনাবাঈ এই অভঙে :

প্রচণ্ড বর্ষা শুরু হয়েছে। নদীর দুই কূল প্লাবিত করে ছুটে আসছে বিপুল বন্যা পন্ধারপুরের দিকে। গ্রামের লোকের বুক ভয়ে কাঁপছে : উন্মত্ত নদী গোটা পন্ধারপুরকেই ভাসিয়ে দেবে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে পরম প্রিয় বিঠ্‌ঠলজীর পবিত্র মন্দির।

এ সঙ্কটে ভয় নেই বলে এগিয়ে এলেন ভক্ত প্রবর নামদেব, বিঠ্‌ঠলজীর মন্দির প্রাঙ্গণে আর নদীর তীরে ভক্তদের নিয়ে শুরু করলেন গগনভেদী নাম-কীর্তন।

জনাবাঈ তাঁর অভঙে লিখেছেন,—স্ফীতকায়া নদী তার দুই তীরের গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে এসে পন্ধারপুরের কাছে এসে শান্তমূর্তি ধারণ করলে। সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। নামদেবের নামগানের মাহাত্ম্যে সেদিন পন্ধারপুর এবং বিঠ্‌ঠলজীর মন্দির রক্ষা পায়।

*   *   *

আর একটা অলৌকিক ঘটনা।

নামদেবের এক পরম অনুরাগী ভক্ত ছিল, নাম ছিল তার চোখা। চোখা জাতিতে অস্পৃশ্য। সাংলৈর মঙ্গলভেদা গ্রামে ছিল তার বাস। নামদেবের সঙ্গে ভারতের নানা তীর্থ সে পরিব্রাজন করে আসে। এতে সে নামদেবের আরও বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, তাকে আরো বেশি করে চেনেন নামদেব ও তার ভক্তির পরিচয় পান।

চোখা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সংসার চালাত, বাকী সময়টা কাটাত সে সাধনভজনে। পন্ধারপুরের ভক্তসমাজের সে পরম

প্রিয়পাত্র ছিল, মাঝে মাঝে তার ডাক পড়ত সেখানে। নৃত্য আর নাম কীর্তনের মধ্য দিয়ে প্রভু বিঠ্ঠলজীর মন্দির চত্বরে ভক্তিরসের তরঙ্গ তুলত সে। তারপর ফিরে আসত নিজের গ্রামে।

হঠাৎ একদিন মঙ্গল ভেদায় এক বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রাজমিস্ত্রীরা ওখানকার দুর্গ মেরামত করছিল। এই সময় দুর্গের প্রাকার ধ্বসে পড়ায় অনেক রাজমিস্ত্রী মারা যায়, তাদের মাঝে চোখাও ছিল। অনেক চেষ্টা করেও মৃতদেহগুলি তখন উদ্ধার করা সম্ভবপর হ'ল না। ধ্বংসস্তূপ অপসারণ করতে সময় লাগল, অপসারণের পর মৃতদেহগুলি কোনটি কার তা বুঝবার আর উপায় রইল না, মাংস সব পচে গলে গেছে, অস্থি ছিন্নভিন্ন।

এদিকে পন্ধারপুরের ভক্ত সমাজ চোখার দেহাস্থি পাবার জন্য রীতিমত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাদের একান্ত ইচ্ছা পরম ভাগবত চোখার পবিত্র অস্থি তারা পন্ধারপুরে এনে সমাধি দিয়ে তার উপর এক স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু মৃতদেহগুলির যে অবস্থা তাতে কোনটা চোখা' তা বুঝবার উপায় নেই।

নিরুপায় হয়ে অগত্যা তারা নামদেবের শরণ নিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্য শুনে বললেন, চোখার অস্থি তোমরা পন্ধারপুরে আনতে চাও, এ অতি উত্তম কথা। চোখার অস্থি বেছে আনতে পারছ না তোমরা, আচ্ছা আমি তার উপায় বলে দিচ্ছি। গলিত মৃতদেহের হাড়গুলি একটি একটি করে তোমরা তোমাদের কানের কাছে ধরবে, যে হাড়ের ভিতর থেকে অবিরাম বিঠ্ঠলজীর নাম ধ্বনিত হ'তে শুনবে, সেইটিই বুঝবে চোখার হাড়।

নামদেবের নির্দেশ মত কাজ করে পন্ধারপুরের ভক্তেরা চোখার হাড় খুঁজে বের করতে পেরেছিল।

অধ্যাপক আর, ডি, রানাডে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,—এ থেকে এই অনুমান করা যায় যে ভক্ত চোখার নামপ্রেম তার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছিল। মরদেহে প্রাণ না থাকলেও ওর পাঞ্চভৌতিক উপাদানের মধ্যে দেহীর ভগবৎভক্তির অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়নি। ভক্তেরা

চোখার দেহাস্থি পন্ধারপুরে নিয়ে এসে বিঠ্ঠল দেবের মন্দিরের প্রধান দরজার সামনে—জ্ঞানদেবের দেহাস্থির পাশে সমাহিত করেন।

শ্রীভোলানন্দ গিরি

সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ সোমেশ চন্দ্র বসুর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, অকালেই হয়েছে। সোমেশবাবুর বয়স তখন তেমন বেশি নয়। স্ত্রীকে তিনি খুব গভীর ভাবে ভালবাসতেন। তাঁকে হারিয়ে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হ'ল তাঁর মনে। তিনি আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে কৃতসংকল্প হ'লেন। কিন্তু এর জন্যে গুরু চাই, তাই খোঁজ চলতে থাকে, কিন্তু মনের মত গুরু আর মেলে না এর কারণও আছে। মনে অধ্যাত্ম সাধনার প্রবল আগ্রহ জাগলেও পত্নীপ্রেমে তাঁর ভাটা পড়ে নি, তাই তিনি এমন গুরু চান—যিনি তাঁর স্বর্গতা সহধর্মিণীর সঙ্গে একত্রে তাঁকে দীক্ষা দিতে পারবেন। এমনি সমর্থ শক্তিধর গুরুর খোঁজে তাঁর বহুদিন কেটে গেল, বহু সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শেষে তিনি যখন ভোলাগিরিজীর পদপ্রান্তে নিজের মনোগত অভিলাষ জানালেন তখন গিরিমহারাজ তাঁকে জানালেন, তিনি তাঁদের দুইজনকেই এক সঙ্গে দীক্ষা দিতে পারেন—কিন্তু একটি সর্তে। সর্তটি হচ্ছে—তিনি যখন পরলোক থেকে তাঁর স্ত্রীকে এনে তাঁর পাশে বসাবেন তখন তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে পারবেন না, তাঁর সঙ্গে কথাও বলতে পারবেন না।

সোমেশবাবু এ সর্ত মেনে নিতে রাজী হ'লেন।

এরপর দীক্ষার পর্ব। দীক্ষার দিন একটি নিভৃত কক্ষে তিনটি আসন পাতা হ'ল। একটিতে দীক্ষা দাতা ভোলানন্দজী বসলেন, আর একটিতে সোমেশবাবু, তৃতীয় আসনটি শূন্য। একটু পরেই সোমেশবাবুর দৃষ্টি সেই তৃতীয় আসনটির দিকে পড়তেই তিনি দেখেন

তাঁর স্বর্গতা স্ত্রী জীবিতাবস্থায় যেমনটি ছিলেন ঠিক সেই মূর্তিতে সেখানে বসে আছেন। বিরহী স্বামী অপার আগ্রহে সূক্ষ্মলোক-বাসিনী তাঁর সহধর্মিণীর দিকে চেয়ে রইলেন, মহাপুরুষের কাছে কথা দিয়েছেন বলে তাঁর সঙ্গে একটিবারও কথা বলবার চেষ্টা করলেন না।

দীক্ষা দেওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর মূর্তিটি কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

* * *

আসামের অমরনাথ রায় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। গিরি মহারাজের শিষ্য তিনি। বাস করছেন তখন শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জে। এই সময় তাঁর বালকপুত্রটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর অবস্থা শেষে এমন সংকটাপন্ন হয়ে দাঁড়ায় যে ডাক্তাররা একেবারে জবাব দিয়ে যান।

ছেলের অবস্থা জানিয়ে অমরবাবু তখন তাঁর গুরুদেব গিরি মহারাজের কাছে তার করলেন। উত্তরে মহারাজ শুধু জানালেন—যথাসম্ভব নাম জপ কর আর দান কর।

আশ্চর্য, সেই রাত্রেই অমরবাবুর ছেলেটি সবাইকে বলতে থাকে, আমি ভাল হয়ে গেছি। সে বলতে থাকে, আমি ভাল হয়ে গেছি স্বামীজী যে আমার কাছে এসেছিলেন।

সবাই কৌতূহলী হয়ে যখন বালককে সব কথা খুলে বলতে বলল, তখন সে যা জানালে তার মর্ম হচ্ছে, স্বামীজীকে সে দেখেছে। খুব উজ্জ্বল মূর্তি, পায়ে খড়ম, মাথায় পাগড়ী, পিছনে তাঁর আরো অনেক সন্ন্যাসী।

সে আরও বললে, স্বামীজী তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন আমার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে রোগের যন্ত্রণা আর আমার কিছু রইল না।

অমরবাবু অবিলম্বে গিরিরাজকে জানালেন যে তাঁরই কৃপায় তাঁর মুমূর্ষু পুত্র প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

এই চিঠি পাবার পর গিরিমহারাজ তাঁর শিষ্য ভক্তদের ডেকে বললেন, তোমরা ত বিশ্বাস করতে চাও না যে, চৈতন্য বা পরমাত্মা সর্বব্যাপী, কিন্তু দেখলে ত আমি ত আর শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জে যাই নি। তোমাদের কাছেই রয়েছি। পরমাত্মা সর্বস্থানেই বর্তমান, দূরে থেকেই এমনি কাজ করছেন। সাধন বলে তাঁকে জানতে পারলে তোমরাও সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান হতে পারবে।

এরপর হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা অমরকে লিখে দাও, আমি যখন তাঁর ছেলেকে নিরাময় করলাম তখন আমার ভিজিট বাবদ সাধুসেবার জন্যে এবার যেন সে বেশি করে চাল পাঠায়।

গিরিমহারাজের এক বাঙালী শিষ্য সেবার সদলবলে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়েছেন। সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর অরণ্যে গিয়ে পড়েছেন তিনি, এমন সময় হঠাৎ মস্তবড় এক বাঘ লাফিয়ে তাঁর সামনে এসে পড়ল। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে হাতের বন্দুক গেল ছিটকে, রইল শুধু একটা সড়কী। তাই নিয়ে হিংস্র বাঘের সঙ্গে লড়তে লাগলেন তিনি। বাঘের আঁচড়ে দেহ ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় শেষে অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

এই সময় হঠাৎ তাঁর গুরু গিরিমহারাজ সেই সুন্দরবনে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি শিষ্যকে উৎসাহ দিয়ে বললে, কোন ভয় নেই তোর, বাঘটার মুখে জোরে সড়কী চালা ও এক্ষুনি মরবে।

এই কথা শোনার সঙ্গে গিরিজীর শিষ্য নতুন করে বল পেলেন, সাহস পেলেন, গুরুর নির্দেশে সড়কী তড়িৎ বেগে চালিয়ে দিলেন বাঘের মুখগহ্বরে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ পর্যুদস্ত হয়ে ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর গুরুদেবকে দেখবার জন্য তিনি ফিরে দেখেন গুরুদেব আর সেখানে নেই। আশেপাশে খুঁজলেও তাঁর আর দেখা পাওয়া গেল না।

কিছুদিন পর এই শিষ্য হরিদ্বারে এসে পরমভক্তিভরে গুরুকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, সেদিন ঐ সুন্দরবনে আপনি উপস্থিত না হ'লে বাঘের হাতেই আমার প্রাণ যেত।

গিরিমহারাজ রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—দূর পাগল, কি যে বলিস তুই, আমি এখানে এই হরিদ্বারে, এ সবই পরমাত্মার খেলা বলে জানবি।

শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

রামদাসজী পরিব্রাজনে বেরিয়ে উত্তরাখণ্ডের গভীর বনাঞ্চলে ঘুরছেন। ঘুরতে ঘুরতে কোন নির্জন পর্বতে পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করা একটা গুহা দেখতে পেলেন। রামদাসজী তখন তরুণ, কৌতূহলী হয়ে গুহামুখ থেকে প্রস্তর খণ্ড সরিয়ে তিনি ওর ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে দেখেন গুহার এক কোণে জটাজুটমণ্ডিত বিরাট-কায় এক বৃদ্ধযোগী ধ্যানে মগ্ন। লোলচর্মের আবরণে চোখদুটি তাঁর ঢেকে গিয়েছে। দেখে কেমন যেন ভয় লাগল রামদাসজীর তিনি তাড়াতাড়ি গুহা থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

এরমাঝে প্রাচীন যোগীর ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় তিনিও এবার গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তারপর চোখের উপর ঝুলেপড়া চর্মাবরণ তুলে রামদাসজীর দিকে চাইলেন। রামদাসের মনে হ'ল যোগীর দুই চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। গভীর কণ্ঠে তিনি রামদাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে রামদাস ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে অস্ফুট স্বরে কোনমতে শুধু বলতে পারলেন, আমি, মহারাজ, আপনার এক দীন চেলা।

আমার চেলা?—বেশ আমার চেলাই যদি হও তা হ'লে আমার আদেশমত কাজ করতে পারবে?

আপনার আশীর্বাদে অবশ্যই তা পারবো।

গুহার কাছেই সুগভীর এক পার্বত্য খাদ। খরস্রোতা এক পার্বত্য নদী মহাগর্জনে বয়ে চলেছে সেখানে। প্রাচীন যোগী সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রামদাসকে বললেন, যদি চেলাই

হয়ে থাক তা হ'লে আমার আদেশে এখুনি তুমি ঐ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়।

শুনে রামদাস তাকালেন একবার নীচে : সর্বনাশ! ঐ প্রচণ্ড প্রবাহে ঝাঁপ দেবার অর্থ ত মৃত্যু। তা হ'লে?

এখন ত আর কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, আদেশ অমান্য করা যায় না। ইষ্টনাম স্মরণ করে সেই উঁচু পাহাড় থেকে লম্ফ দিয়ে পড়লেন রামদাস নীচে সেই খরস্রোতা নদীর বুকে। দেহখানি ভেসে চললো নদীর তীব্র স্রোতে।

এই সময় হঠাৎ এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। বৃদ্ধ তপস্বী তাঁর অসামান্য যোগবিভূতি বলে তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন নীচের দিকে। মুহূর্ত মধ্যে তা দীর্ঘায়িত হয়ে রামদাসের স্রোত-বাহিত দেহ স্পর্শ করল। শুধু তাই নয় যোগীর হস্তাকর্ষণে রামদাসের ভাসমান দেহ শূন্যে উত্থিত হয়ে গুহা দ্বারে আনীত হ'ল।

রামদাস ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত। মুখে তাঁর একটিও কথা নেই। যোগীবরের নয়নে আগেকার সেই ক্রোধাগ্নিও আর নেই। প্রসন্ন হাসি মুখে তিনি রামদাসকে আশীর্বাদ করে বললেন, হ্যাঁ, বেটা, তুমি চেলা হবার যোগ্য। কল্যাণ হোক তোমার। কিন্তু এখানে তুমি আর থেকো না। ঋষিদের এ এক বিশিষ্ট তপঃক্ষেত্র। এখন তোমার এখানে থাকা চলে না।

যোগীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিয়ে রামদাস তাঁর সাধনস্থল থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

* * *

এবার রামদাসজীর গুরুর কথা কিছুটা বলে নেওয়া যাক।

রামদাসজীর গুরুর নাম ছিল দেবদাসজী। পূর্বাশ্রম ছিল তাঁর অযোধ্যায়। এই মহাত্মার যোগবিভূতি ছিল অপরিমেয়, তা ছাড়া তাঁর জীবনযাত্রার সবকিছুই প্রায় অলৌকিক।

মাঝে মাঝে একই আসনে ছয়মাস কাল পর্যন্ত জড়সমাধিতে

মগ্ন থাকতেন। দেখে তরুণ শিষ্য রামদাসের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। নয়নে নিদ্রারও লেশ ছিল না দেবদাসজীর।

সবচেয়ে বেশি বিস্ময় লাগত রামদাসের—গুরুর আহার্য গ্রহণ দেখে। দেবদাসজী তাঁর সামনের ধুনী থেকে কিছুটা ভস্ম নিয়ে কমণ্ডলুর জলে ফেলে দিতেন, তারপর সেই বিভূতি-মিশ্রিত জল সবটাই পান করতেন। কিছুক্ষণ পর ওই জল উদ্গীরণ করে ফেলতেন। প্রতিবারই মাপ করে দেখা যেত সমপরিমাণ জলই তাঁর পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই ছিল দেবদাসজীর দৈনন্দিন আহার।

মাঝে মাঝে যে এ আহার সম্বন্ধে দেবদাসজীর ব্যতিক্রম দেখা না যেত তা নয়। একবার তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে ডেকে বললেন—দেহে তিনি প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করছেন, অবিলম্বে তাঁকে প্রচুর দুগ্ধ পান না করালে এ থেকে তাঁর আর নিস্তার নেই।

রামদাসজী তখনই একটি বৃহৎ ভাণ্ড নিয়ে গৃহস্থদের বসতিতে গিয়ে প্রায় আধমণ দুধ সংগ্রহ করে আনলেন। হাঁড়িটা সামনে আনলেই দেবদাসজী ঢক্‌ঢক্‌ করে সবটা দুধই পান করে ফেললেন।

কিন্তু দেহের উত্তাপ তাতেও গেল না, বললেন আরও দুধ আনো।

ব্যাপার দেখে রামদাসের ত একেবারে চক্ষুস্থির। হাত জোড় করে সানুনয়ে তিনি বললেন, বাবা, তুমি ত সাক্ষাৎ পরমাত্মা, তোমার দেহের উত্তাপ দূর করবার সামর্থ কি আমার আছে? আধমণ দুধ ত দেখতে না দেখতে শেষ হয়ে গেল। এখন আর কি করা যায় বলো?

দেবদাসজী স্মিতমুখে বললেন, না বেটা, তুমি আরও কিছুটা দুধের যোগাড় করো, তা পান করলেই পিপাসা আমার নিশ্চয় মিটবে।

কি আর করবেন রামদাস, বাধ্য হয়ে আরও কিছুটা দুধের যোগাড় করলেন। তা পান করবার পর দেবদাসজীর দেহের তাপ দূর হ'ল।

* * *

ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের পরীক্ষার জন্য মাঝে মাঝে তাঁকে অদ্ভুত আদেশ করতে দেখা যেত। একবার কোন পার্বত্য শহরের নিকটে এক বিজন বনে দেবদাসজী আসন পেতেছেন। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর রামদাস এবং আরও কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য।

মাঝরাত্রে হঠাৎ দেবদাসজী আদেশ করে বসলেন—কাছের শহর থেকে এখনই তাঁর জন্যে দু'টাকার গাঁজা কিনে আনতে হবে, শিষ্যদের কেউ এখনই রওনা হয়ে যাক।

শিষ্যেরা ত গুরুর আদেশ শুনে একেবারে থ। হিংস্র জন্তুসঙ্কুল এ বনে এখন চলতে গেলে ত প্রাণ হাতের মুঠোয় করে যেতে হবে। আঁধারে পথ চিনে বেরুবারও উপায় নেই। তা ছাড়া নিঃসম্বল সাধুদের কাছে টাকাকড়িও ত কিছু নেই। এত রাত্রে শহরে ভিক্ষাই বা কি করে মিলবে? তাহ'লে?

শিষ্যেরা এই ভেবে মাথা নীচু করে থাকলেও রামদাস কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন: গুরুর আদেশ পালন করতে তিনি প্রস্তুত। দেবদাসজী দেখে খুশী হয়ে বললেন, বেশ, বাচ্চা তুমিই পারবে। টাকার জন্য তোমার কিছু ভাবতে হবে না, শহরে গেলেই একটি লোক তোমায় দুটো টাকা দেবে, তাই দিয়ে তুমি গাঁজা কিনে আনো।

নিশীথ রাত্রি। বনপথ ধরে রামদাস শহরে পৌঁছলেন। রাস্তাঘাটে জনপ্রাণীর দেখা নেই। গৃহস্থ ও দোকানীরা ঘরের আলো নিভিয়ে ঘুমুচ্ছে। কিছু এগিয়ে রাস্তার একটা মোড় ঘুরতেই রামদাস দেখেন একটা ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। দরজায় ঘা দিতেই সে ঘর থেকে দ্রুত একটি লোক বেরিয়ে এল। এই নিশীথ রাত্রে সাধুর দর্শন পেয়ে তার যেন আনন্দের সীমা নেই। রামদাসকে ভক্তিভরে প্রণাম করে জোড় হাত করে সবিনয়ে সে জানাল—আজ তার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। সকাল থেকেই সে সঙ্কল্প করে আছে কোন সাধুকে সে দুটো টাকা ভেট দেবে। সারাদিন তার

প্রতীক্ষায় কেটেছে। এই মধ্যরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে ভগবান তার অভিলাষ পূর্ণ করলেন।

টাকা দুটি নিয়ে রামদাস গুরুদেবের জন্য গাঁজা কিনলেন। এবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। বনপথ ঘন অন্ধকার। ঠাণ্ডাও বেশ পড়েছে। রামদাসজী গুরু সেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদী গঞ্জিকা সেবনেও বেশ কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছেন। ক্লান্ত হয়েছে দেহ। ভাবলেন—গুরুর এই গাঁজা থেকে এক ছিলিম বের করে নিয়ে এক কলকে টেনে গেলে মন্দ কি? করলেনও তিনি তাই। এক ছিলিম টেনে চাঙ্গা হয়ে তৃপ্তমনে ধীরে ধীরে বনপথ দিয়ে গুরুর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

গাঁজার পুটলিটি গুরুর পায়ের কাছে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে গুরু শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলে উঠলেন, গুরুসেবা বুঝি শিষ্যের এমনি করেই করতে হয়? ভোগের অগ্রভাগ আগে নিয়ে পরে গুরুকে নিবেদন!

শুনে ভয়ে বিস্ময়ে রামদাস একেবারে হতবাক্। যে কথা কেবল শোনা ছিল আজ তার একেবারে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলল: গুরুদেব অন্তর্যামী, মহাশক্তিধর। তাঁর অলৌকিক দৃষ্টি যে কোন বাধা যে কোন দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

ভীত অনুতপ্ত রামদাস তখন গুরুর মার্জনা ভিক্ষা করে সংক্ষেপে বলতে লাগলেন তিনি অবোধ শিশুমাত্র। গুরুর মহিমা সম্বন্ধে তাঁর এখনও বোধোদয় হয় নি।

শিষ্যের কাতরতা দেখে গুরুর মন নরম হ'ল। তিনি বললেন, ঠিকই, তুমি একান্ত বালক। কিন্তু জেনে রেখো—প্রকৃত সদ্গুরুর দৃষ্টি থেকে মনের সামান্যতম চিন্তাও কখনও গোপন রাখা যায় না।

* * *

একবার রামদাস তাঁর গুরুর সঙ্গে পাঞ্জাবের কোন তীর্থের দিকে যাচ্ছেন। যেতে যেতে লাহোরের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় তাঁরা আসন পেতে বসলেন। নানা দিক থেকে আরও অনেক সন্ন্যাসী এসে জুটেছেন সেখানে। সাধুদের রীতিমত একটা বড়

জমায়েৎ। লাহোরের অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আনাগোনা করতে লাগলেন এঁদের কাছে।

রামদাস ও দেবদাসজীর সামনে এক প্রসিদ্ধ ধনী শেঠ এসে বসেছেন। শালের ব্যবসায় শেঠ প্রতি বৎসর অনেক টাকা উপার্জন করে।

দেবদাসজী হঠাৎ তাকে বলে বসলেন, আজ তুমি এ জমায়েতের সাধুদের জন্য ভাণ্ডারা দাও।

জমায়েতের সাধুদের সংখ্যা অনেক, হাজারেরও বেশি, দেখে চমকে উঠলেন শেঠজী। মন চাইল না এত সাধুর ভাণ্ডারা দিতে। শুধু তাই নয় সাধুসন্তের সম্বন্ধে কিছু বিরূপ শ্লেষাত্মক মন্তব্যও তিনি করলেন।

শুনে কুপিত হ'লেন দেবদাসজী, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, বেনিয়া, ধনগর্বে মাথা তোমার গরম হয়ে উঠেছে দেখছি, তাই সর্বত্যাগী সাধুদের সম্বন্ধে এমন কথা বলতে সাহস করলে। এর জন্যে তোমার কিছু দণ্ড হওয়া উচিত। ঘরে গিয়ে দেখ অগ্নিদেব তোমার শালের গুদামে আবির্ভূত হয়েছেন।

যত সব অলুক্ষুণে কথা।—বলে উঠলেন শেঠজী। কিন্তু সাধুর কথা শুনে বেশ কিছুটা ভয়ও এসে গেল তাঁর মনে, অমনি ছুটলেন তিনি বাড়ির দিকে।

এদিকে সামনের ধুনীতে কিছুটা জল ছিটিয়ে দিয়ে দেবদাসজী মুচকি হেসে রামদাসকে বললেন, বেনিয়ার শালগুদামে এই আগুন শুরু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই শেঠজী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন দেবদাসজীর সামনে। এসে অশ্রুসজল চক্ষে হাতজোড় করে বললেন, মহারাজ, রক্ষা করুন, আমার সর্বনাশ উপস্থিত। আপনি কৃপা না করলে আমি ধনেপ্রাণে মারা যাব। আমার শালগুদাম বেশ সুরক্ষিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি করে যে তাতে আগুন লাগল তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি নিতান্ত অবোধ, সাধুদের সম্বন্ধে কটু কথা বলে

আমি অপরাধ করেছি। আমার এ অপরাধ আপনি মার্জনা করুন। আমি এবার কথা দিচ্ছি এ সাধু জমায়েতকে আমি সাতদিন ধরে ভাণ্ডারা দেব।

শেঠজীর কাতর প্রার্থনায় দেবদাসজীর মন এবার নরম হ'ল, তিনি তখন শেঠকে অভয় দিয়ে বললেন, শান্ত হও, বেটা, গুদামের আগুন তোমার এখনই নিভে যাবে, কিন্তু আর কখনও সাধুদের অবজ্ঞা করো না। আর যে অবজ্ঞা তুমি তাঁদের করেছ তার জন্য শাস্তি তোমার কিছু পেতেই হবে। তোমার গুদামের একখানা দামী শাল এর জন্য নষ্ট হবে। যাও, আর এ রকম অপরাধ যেন না হয়!

শেঠ বাড়ি গিয়ে দেখলেন সাধুর কথাই ঠিক: মাত্র একখানা দামী শালই তাঁর আগুনে দগ্ধ হয়েছে, গুদামের আর বড় কোন ক্ষতি হয় নি।

* * *

একবার রামদাসজী ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে গুরু মধ্য ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন, ভূপালতাল সরোবরের কাছাকাছি এসে হঠাৎ তিনি শিষ্যদের একটু দূরে থাকতে আদেশ দিয়ে নিজে সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে বারবার জোরে শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন।

সরোবরের অপর তীরে মুসলমান নবাবের বিরাট প্রাসাদ। এর আগে নবাব ঘোষণা করেছেন ঐ সরোবরের তীরবর্তী এলাকায় কেউ শঙ্খধ্বনি করতে পারবে না। যে করবে তার শিরচ্ছেদ করা হবে।

এ আদেশ অমান্য করে কে শঙ্খ বাজায় দেখবার জন্য নবাব তখনই লোক পাঠালেন। সে লোক ফিরে গিয়ে নবাবকে বললে, দেখলাম আপনার আদেশ অমান্য করে এক হিন্দু সন্ন্যাসী শঙ্খ বাজাচ্ছে।

শুনে নবাব ত একেবারে রেগে আগুন: এত বড় স্পর্ধা, আমার আদেশ অমান্য করে কাফের ফকির বারবার এমনি করে শঙ্খ

বাজায়! দুঃসাহস ত কম নয়! প্রহরীদের তখনই তিনি হুকুম দিলেন, তোমরা গিয়ে এখনই ঐ ফকিরের শিরচ্ছেদ করে অথবা তাকে গ্রেপ্তার করে আনো।

নবাবের হুকুম তামিল করতে এসে নবাবের অনুচররা দেখে সেখানে ত কোন জীবিত মানুষ নেই, আছে কেবল এক হিন্দু সাধুর ছিন্ন মস্তক এবং রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

নবাবের অনুচরেরা ফিরে গিয়ে তাঁকে এই সংবাদই দিলে। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, আবার যে শঙ্খধ্বনি শোনা যায়—সেখান থেকেই, তেমনি জোরে, বারবার। প্রহরীদের আবার পাঠালেন নবাব। প্রহরীরা দ্রুতবেগে ছুটে এসে এবার যা দেখল তা আরও তাজ্জব, আরও রহস্যময়। কোন ছিন্ন শির রক্তাক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোন কিছু নেই সেখানে, এমন কি রক্তেরও কোন চিহ্ন নেই।

প্রহরীদের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে নবাবের মন পালটে গেল। তাঁর ধারণা হ'ল যে সাধু শঙ্খনাদ করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই কোন মহাশক্তিধর যোগীপুরুষ। যুগপৎ তাঁর মনে ভয় এবং ভক্তির উদয় হ'ল, বুঝলেন এ পীরের সঙ্গে বিরোধ করা চলে না।

দরবারের আমিরদের নিয়ে এবার নিজেই তিনি সরোবরের অপর তীরে হাজির হয়ে দেখলেন দীর্ঘজটাজুটধারী এক তেজোপুঞ্জ সন্ন্যাসী সেখানে বসে রয়েছেন।

যোগীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে তিনি তাঁর সেবা ও পরিচর্যা করবার জন্য ব্যগ্রতা জানাতে লাগলেন।

যোগীবর নবাবকে প্রশান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, শঙ্খধ্বনি নিষেধ করে আদেশ জারি করা তোমার উচিত হয় নি। তুমি মুসলমান, তুমি নিজের ধর্ম পালন করো, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তাদের নিজের নিজের ধর্ম পালন করতে সুযোগ দাও। তুমি যে অন্যায় আদেশ ঘোষণা করেছ তা তুমি অবিলম্বে প্রত্যাহার কর।

নবাব তখনই দেবদাসজীর আদেশ মাথা পেতে নিলেন। দেবদাসজী এরপর ভূপালতাল সরোবরের তীরে এক দেবমন্দির

প্রতিষ্ঠা করেন। রামদাস কাঠিয়া বাবা একেই পরে তাঁর গুরুর দ্বার বলে অভিহিত করতেন।

*   *   *

শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার এক শিষ্যের নাম ছিল মৌনীজী। মৌনীজীর আগেকার নাম প্রেমদাসজী। প্রেমদাসজীর স্বভাব ছিল বড় কোপন, ক্রোধের কারণ ঘটলে তিনি বড় কটু কথা বলতেন। এতে গুরু তাকে বারো বৎসর মৌনী থাকতে আদেশ দেন। সেই থেকে এঁর নাম হ'ল মৌনীজী.

মৌনব্রত ভঙ্গ করবার পর কোন কারণবশতঃ অভিমান ভরে কিছুদিনের জন্য তিনি বাবার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তীব্র অনুশোচনা এবং গুরুর জন্য দুশ্চিন্তায় আবার তিনি গুরুর কাছে ফিরে আসেন। বাবাজী মহারাজ আসনের উপর শুয়ে বিশ্রাম করছেন এমন সময় মৌনীজী এসে তাঁর পদসেবা করতে লাগলেন। অনুতপ্ত শিষ্যের নয়ন দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত।

বাবাজী তখন ধীর কণ্ঠে তাকে বলতে লাগলেন, ওরে আমি বুড়ো হয়েছি তাই তুই আমার কাছে আর থাকতে চাস না। আমি কষ্ট পেয়ে মরে যাব, তারপর তুই আশ্রমে ফিরে আসবি, কেমন তাই ত?

শুনে মৌনীজীর দুই চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগল। এক হাত দিয়ে তিনি চোখের জল মোছেন আর এক হাতে গুরুজীর চরণ সেবা করতে থাকেন।

হঠাৎ এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখেন হাত তাঁর এখন গুরুজীর চরণের উপর পড়ছে না, পড়ছে বাবাজীর শূন্য শয্যার উপর। বাবাজী মহারাজের দেহটি সেখানে আর নেই। গুরুজীর আকস্মিক অন্তর্ধানে মুহ্যমান হয়ে মৌনীজী অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরই আবার এক নতুন বিস্ময়: মৌনীজী দেখলেন গুরুজীর দেহ আবার ফিরে এসেছে। আগের মতই নিশ্চল হয়ে শুয়ে রয়েছেন তিনি তাঁর আসল শয্যায়।

কাঠিয়া বাবা অভিমানে ক্ষুণ্ণ স্বরে এবার শিষ্যকে বলতে লাগলেন, কেমন রে, আমি এই ভাবে চলে গেলে তুই খুশী হবি ত, বল্, তা হ'লে আমি চলে যাই। তোরা যদি এ বুড়োকে ছেড়ে এমনি করে চলে যাস ত, তবে এ জীর্ণ দেহটাকে কে সেবা-শুশ্রূষা করবে একবার বল্ দেখি।

মৌনীজী এবার নির্বাক্ বিস্ময়ে গুরুকে পরিক্রমণ করে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন, বুঝলেন এ গুরুর মাহাত্ম্য বুঝবার ক্ষমতা তিনি এখনও অর্জন করেন নি।

* * *

কাঠিয়া বাবার শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং মানস-সন্তান ছিলেন সন্তদাস মহারাজ। সন্তদাস বাবাজীর পূর্বাশ্রমের নাম তারাকিশোর চৌধুরী। কলিকাতা হাইকোর্টের এক বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন ইনি।

বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ হয় নি—মাত্র দু' একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তখনকার কথা। কাঠিয়া বাবাজী তাঁকে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে উঠে ধ্যান করতে বলেন। কিন্তু আগেকার অভ্যাস লোকের ত্যাগ করা কঠিন, তাই তারাকিশোর বাবুর ঐ সময় ওটা বড় কঠিন হয়।

একদিন ঘরে জানলার ধারে মশারি খাটিয়ে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। শেষ রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি শুনলেন কে যেন জোর গলায় ডেকে তাঁকে বলছে, ওরে ওঠ, ওঠ, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরের উপর পড়ল মস্তবড় একটা ইটের ঢিল।

তারাকিশোর বাবু চমকে উঠে বসলেন, ঢিলটা কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, কোত্থেকে এসে তাঁর গায়ে লাগল, কে ফেললো? মশারির কোথাও ফাঁক নেই, এটা কি করেই বা ভিতরে এল? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল বাবাজী মহারাজের নির্দেশিত সময়ে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করছেন না দেখে অতন্দ্র সমর্থ যোগীপুরুষ কাঠিয়া বাবাই তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এরপর

থেকে শেষ রাত্রে উঠে সাধন ভজন করতে আর কোনদিন তাঁর ভুল হয় নি।

*   *   *

নিজের প্রতি বাবাজী মহারাজের এক অলৌকিক কৃপার এক বিবৃতি দিয়েছেন সন্তদাসজী—(তারাকিশোরবাবু)।

"এক দিবস ছাদের উপর শুইয়া আছি; শেষরাত্রে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিলাম এবং বসিবামাত্র দেখিলাম যেন আকাশ ভেদ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি আমার সম্মুখে ছাদের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করিয়া তখনই একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে উপদেশ করিলেন। মন্ত্রে উপদেশ করিয়া তিনি আকাশপথে উড্ডীন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অদৃশ্য হইলেন।"

*   *   *

কলকাতা থাকতে তারাকিশোরবাবু একবার কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকলেও জ্বর কমবার কোনই লক্ষণ দেখা যায় না, বরং ক্রমেই তা বেড়েই চলেছে। এই সময় এক অদ্ভুত খেয়াল হ'ল তারাকিশোরবাবুর। ভাবলেন বাবাজীমশায় ত সব সময়ই গাঁজা খান, আর খেতে পেলে বড় খুশীও হ'ন, তা হ'লে তাঁকে একবার গাঁজাই ভোগ দিই না, তারপর সেই প্রসাদীবস্তু যদি নিজে পান করি, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার এ জ্বর সেরে যাবে।

এই কথা মনে হতেই বাজার থেকে নতুন কলকে এবং গাঁজা আনিয়ে ছিলিম সাজিয়ে তা বাবাজী মহারাজকে নিবেদন করা হ'ল।

ভোগ করার পর তারাকিশোরবাবু তাকিয়ে রইলেন সে ছিলিমের দিকে। তাঁর মনে হ'ল তাঁর গুরুমহারাজ ওটা পান করছেন, শুধু তাই নয় তিনি দেখলেন কলকে থেকে সত্যি সত্যি ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তিনি এ প্রসাদী গাঁজা নিয়ে নিজে পান করলেন। আশ্চর্য ব্যাপার—কিছু সময়ের মাঝেই তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল।

কিছুদিন পরের কথা।

তারাকিশোর কাঠিয়াবাবাজীর চরণদর্শনে বৃন্দাবনে এসেছেন এসে দেখেন বাবাজী কয়েকজন ব্রজবাসীকে নিয়ে গঞ্জিকা সেবন করছেন। তারাকিশোর পাশের কামরায় গিয়ে বসলেন। একটু পরে বাবাজী তারাকিশোরকে ডাকলেন, কই হে এবার তুমি প্রসাদি ছিলিম পান করে যাও।

বাবাজীর এই কথা শুনে একজন ব্রজবাসী বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবুজীরও অভ্যাস আছে নাকি ?

কাঠিয়াবাবা চতুর হাসি হেসে বললেন, না, অভ্যেস যাকে বলে তা অবশ্য নেই, তবে জরটর হলে বাবা মহারাজকে স্মরণ করে কিছু ঐ দ্রব্য ভোগ দেয়, তারপর তাঁর প্রসাদটুকু ভক্তিভরে পান করে।

তারাকিশোরবাবু তখন বুঝলেন সর্বজ্ঞ গুরুজীর কাছে কোন কিছুই অজানা থাকে না। আর এও বুঝলেন—কলকাতায় থাকতে যে গঞ্জিকা তিনি গুরুকে নিবেদন করেছিলেন তা তিনি সত্যি সত্যিই গ্রহণ করেছিলেন।

আশ্রয় দানের পর সদগুরুকে শিষ্যের অনেক কিছুর ভার বহন করতে হয়, কাঠিয়াবাবার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তারাকিশোরবাবু কোন কর্মোপলক্ষ্যে শহরের বাইরে গেছেন। শহরে চোরের বড় উপদ্রব। ঘরে লোকজন একেবারে নেই, তাই তাঁর স্ত্রীর রাত্রিটা বড় ভয়ে ভয়ে কাটে। দরজা জানলা খুলতে সাহস পান না।

গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরম পড়েছে। একদিন রাত্রে গরম সহ্য করতে না পেরে, ঘরের একটি জানলা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখেন জানলা থেকে একটু দূরে বাবাজী মহারাজ দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন।

স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বাবাজী মহারাজ বলে উঠলেন, মাঈ, তোমার এত ভয় কেন বলো ত ? আমি ত সবসময়ই তোমার কাছে কাছে থাকছি।

এই বলার পরই বাবাজী মহারাজের দিব্যমূর্তিটি কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল

বাবা গম্ভীরনাথজী

মহাযোগী গম্ভীরনাথজী তাঁর অলৌকিক যোগৈশ্বর্য সচরাচর বড় প্রকাশ করতে চাইতেন না। তবু ভক্ত শিষ্য আর্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিতে গিয়ে তার যোগবিভূতি প্রকট না হয়ে পারত না।

আকু ও মুন্নি দুই ভাই। দীর্ঘদিন ধরে বাবা গম্ভীরনাথের সেবা করে তারা তাঁর অনুগ্রহ ভাজন, কৃপাপাত্র। পরম ভক্ত তারা বাবার।

দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় আকুর অবস্থা একবার সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। বাঁচবার কোন আশাই তার আর থাকে না। অবশেষে একদিন মৃত্যুর সকল লক্ষণই তার দেহে প্রকাশ পেল। আত্মীয়স্বজনেরা তার সৎকারের আয়োজনে উদ্যোগী হ'ল। ছোট ভাই আর এ দেখে ঠিক থাকতে না পেরে ছুটে গম্ভীরনাথের আসনের কাছে এসে তাঁর পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বাবা, তোমার একান্ত সেবক আকু আজ এইমাত্র মারা গেল। কিন্তু, বাবা আমরা ত জানি তোমার অসাধ্য কিছুই নেই, তুমি কৃপা করে তাকে আজ বাঁচাও।

চোখ মেললেন মহাযোগী। মুন্নির কান্নায় মুখে ফুটে উঠল তাঁর অপার করুণা। আকুর-শবসৎকারে নিষেধ আজ্ঞা দিয়ে মুন্নিকে তিনি তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও গিয়ে হাজির হ'লেন আকুর মৃতদেহের পাশে।

আকুর দেহটি স্পর্শ করে কমণ্ডলু থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দিলেন তিনি তার মুখে। এর পরই সবাই অবাক্ বিস্ময়ে দেখল আকুর দেহে প্রাণস্পন্দন আবার ফিরে আসছে। একটু পরেই সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে বিছানায় পাশ ফিরল।

আকুর এই অলৌকিক চিকিৎসার পর আকুর পথ্যের ব্যবস্থাও হ'ল বিচিত্র। গম্ভীরনাথ সেদিন তার পথ্যের ব্যবস্থা করলেন খিচুড়ী।

আকু তারপর বহুদিন বেঁচে ছিল।

কপিল ধারায় যোগী গম্ভীরনাথজীর আসনের সামনে মাঝে মাঝে এক বাঘ এসে হাজির হ'ত। এ আসত যখন বাবার কাছে আর কেউ বড় থাকত না। এসে মহাযোগীকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে আবার কোথায় চলে যেত তা কেউ জানে না।

একদিন কিন্তু সচরাচর যা ঘটে না তাই ঘটল। বাঘটি এল যখন বহু ভক্ত এবং শিষ্য যোগীবরকে ঘিরে বসে আছেন তখন। ব্যাঘ্রের আগমনে উপস্থিত সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বাবা তখন সবাইকে আশ্বাস দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন,ভয় পাবেন না আপনারা, স্থান ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই। চুপ করে বসুন। ইনি ব্যাঘ্ররূপে এক মহাপুরুষ।

যোগীবরের কথায় কেউ অবশ্য-স্থান ত্যাগ আর করলেন না। ভীতিবিস্ময়-মিশ্রিত চোখে এই ব্যাঘ্রপুঙ্গবের দিকে চেয়ে রইলেন। বাঘটি বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে যোগীবরের দিকে তাকিয়েথাকবার পর ধীরে ধীরে আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেল।

* * *

একবার উদয়পুরে গিয়েছেন গম্ভীরনাথজী, সঙ্গে রয়েছেন আট দশজন সন্ন্যাসী। একটি জনবিরল মাঠের-মাঝে ধুনী জ্বালিয়ে ধ্যানে বসেছেন।

বর্ষাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের মাতামাতি সুরু হয়ে গেল, সঙ্গে বৃষ্টি। প্রবল বর্ষণে চারিদিক একেবারে জলে জলময় হয়ে গেল, কিন্তু বাবা গম্ভীরনাথ মাঠের যে অঞ্চলে সঙ্গীদের নিয়ে বসে সেখানে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে দেখা গেল না। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা বাবা গম্ভীরনাথের মাহাত্ম্য জানতেন। তাঁরা বুঝলেন এ অলৌকিক কাণ্ডটি এই শক্তিধর মহাপুরুষের যোগশক্তির বলেই ঘটতে পেরেছে।

অতিথি সেবার ব্যাপারে মাঝে মাঝে গম্ভীরনাথজী তাঁর যোগ-বিভূতির পরিচয় দিতেন। বিভিন্ন সময়ে মঠের নানা উৎসবে সাধুসন্ত ও ব্রাহ্মণ ভোজনের রেওয়াজ ছিল। এ সময়ে নিমন্ত্রিতের পরিতৃপ্তির জন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না।

একবার মন্দিরে বহুসংখ্যক লোকের নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু ভোজনে বসাতে গিয়ে দেখা গেল যা আশা করা গিয়েছিল, লোক এসেছে তার দ্বিগুণ। আশ্রমবাসীরা কি করবেন ভেবে দিশে না পেয়ে ছুটে গিয়ে বাবার শরনাপন্ন হ'লেন।

ব্যাপারটার সঙ্গে গুরুধাম এবং গোরক্ষনাথজীর মঠের মর্যাদা জড়িত রয়েছে। গম্ভীরনাথজীর ধ্যান-স্তিমিত-নয়ন তাই তখনই সজাগ হয়ে উঠল। তিনি উঠে ধীরে ধীরে তাঁর পেটিকার কাছে গেলেন। তা থেকে একটা নতুন চাদর বের করে সেবকের হাতে দিয়ে বললেন, এখনি গিয়ে এ চাদর দিয়ে আহার্য যা কিছু আছে সেসব ঢেকে ফেল। তারপর সেগুলোর একপাশ থেকে পরিবেশন করতে থাকবে। ভয় নেই, নাথজীর কৃপায় কোন কিছুর অভাব হবে না।

বাবার নির্দেশ অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করা হ'ল। সবাই অবাক হয়ে দেখলেন দ্বিগুণ লোক পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করবার পরও আহার্য উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে।

শুধু এই নয়। গ্রীষ্মকালে আশ্রমের বাগানে আম পাকলে গম্ভীরনাথ প্রতি বৎসরেই এক ভোজের আয়োজন করতেন। অতিথিদের এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে আম খাওয়ানো হ'ত। একবার ভোজে অপ্রত্যাশিতভাবে বহু অভ্যাগতের সমাগম হ'ল। হঠাৎ এত লোক এসে পড়ায় আশ্রমবাসীরা হকচকিয়ে গেলেন। বাজার থেকে যে আম কিনে আনবেন তারও আর সময় নেই। অগত্যা কর্মীরা ছুটে গিয়ে বাবার কাছে তাদের এ সঙ্কটের কথা জানালেন।

বাবা আদেশ দিলেম আমের ঝুড়িগুলি সব এনে তাঁর তক্তপোষের নীচে রেখে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে এবং পরিবেশনের সময় ওর একপাশ থেকে আম তুলতে। বাবার নির্দেশ মত সবকিছু করে সেবকরা নিমন্ত্রিতদের পরিতৃপ্তির সঙ্গে আম্রভোজন করিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন আম তখনও নিঃশেষিত হয়নি।

*　　　　*　　　　*

অতুলবিহারী গুপ্ত তাঁর রচিত মৃত্যুর পারে ও পুনর্জন্মবাদ নামক গ্রন্থে গম্ভীরনাথজীর যোগৈশ্বর্যের এক প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। ঘটনাটির মর্ম কথা আমি এখানে নিজের ভাষায় বর্ণনা করছি।

অতুলবাবু গোরখপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের এক শিক্ষক। গম্ভীর-নাথজীর ভক্ত। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ও গম্ভীরনাথজীর ভক্ত। যোগীবরের চরণ দর্শন করতে দুইজন একদিন গোরক্ষনাথ মঠে গেলে এক করুণ দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ল। দেখলেন শহরের এক সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরের মহিলা গম্ভীরনাথজীর চরণ ধরে কাঁদছেন। মহিলার পুত্র ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য বিলেতে গিয়েছেন, গত চার মাস ধরে তাঁর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর নিজের কোন পত্র ত পাওয়া যায়ইনি, ওখানকার এক বন্ধুর কাছে এঁরা তাঁর সংবাদের জন্য পত্র লিখেছিলেন তিনিও কোন খোঁজ খবর দিতে পারেননি।

মহিলা পুত্রের খবরের জন্য বাবার পা ধরে অনেক কান্নাকাটি করতে থাকলে তিনি ঝামেলা এড়ানোর জন্যে শান্ত কণ্ঠে বললেন, মা, গরীব সন্ন্যাসী ফকির মানুষ আমি, বিলেতের খবর আমি কি করে জানবো—বলো ?

মহিলা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী ন'ন, অনেক অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে তিনি কাতর কণ্ঠে বললেন, বাবা, আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করলে কি হ'বে, আমি বেশ ভাল করেই জানি আপনি ইচ্ছা করলেই আমার ছেলের সংবাদ এনে দিতে পারেন, কৃপা করুণ আমায়, বাবা, এ মহা সংকট থেকে আমায় উদ্ধার করুন।

যোগীবরের প্রশান্ত মুখে এবার মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি শান্ত হও, মা, দেখি এ ব্যাপারে তোমাকে আমি কতটা কি সাহায্য করতে পারি।

—এই বলে গম্ভীরনাথ নিজের প্রকোষ্ঠে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ

করলেন। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে তিনি নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে মহিলাটিকে আশ্বস্ত করে বললেন, মাঈ, আসছে সোমবার তোমার ছেলে ঠিক গোরখপুরে এসে হাজির হ'বে। ভাল আছে সে, এখন সে জাহাজে রয়েছে, তুমি তার জন্যে কিছু ভেবো না।

যোগীবরের উপর মহিলার ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস প্রচুর। পুত্রের কুশল ও আগমন সংবাদ তাঁর মুখে শুনে আশ্বস্ত হয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন।

পরের ঘটনা সম্বন্ধে অতুল গুপ্ত মশায় লিখেছেন, পরের বুধবার বিকেল প্রায় চারটের সময় অঘোরবাবু আমায় ডেকে পাঠালেন। তাঁর বাংলোতে গিয়েই দেখলাম স্যুটপরা এক হিন্দুস্থানী যুবক তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখেই অঘোরবাবু বলে উঠলেন, সেদিন যে এক মহিলা তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের খোঁজে বাবা গম্ভীর নাথের কাছে গিয়েছিলেন, এই তাঁর সে নিরুদ্দিষ্ট পুত্র। বাবার কথা মত সোমবারেই ও এখানে এসে পৌঁছেছে। এর মা যে এর খোঁজে বাবার কা‍ছে গিয়েছিলেন সে খবর ও জানে না। আমি এখনই একে এবং তোমাকে নিয়ে বাবার কাছে যাব।

অঘোরবাবু আমাকে এবং তরুণ ব্যারিষ্টারকে নিয়ে গোরক্ষ নাথের মঠে এলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম বাবা তাঁর পূর্বাভ্যাস মত তাঁর কুটীরের সামনে দালানে একা বসে রয়েছেন। তরুণ ব্যারিষ্টার বাবাকে দেখেই বলে উঠলেন, হ্যালো সে'ণ্ট, ইউ আর হিয়ার! অঘোরবাবু শুনে বিরক্ত হয়ে বললেন, ওঁর সঙ্গে ইংরেজি বাত কেন, উনি ইংরেজি জানেন না।

আমরা সবাই আসন গ্রহণ করবার পর যুবক গম্ভীরনাথজীকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কবে 'এখানে এলেন?' আমি জাহাজ থেকে নেমে ইম্পিরিয়াল মেল ধরি। কিন্তু সে গাড়িতে ত আপনি ছিলেন বলে আমার মনে হয় না।

অঘোরবাবু তখন তরুণ ব্যারিস্টার-কে বললেন। তোমার কথা

শুনে মনে হচ্ছে, এর আগে বাবাকে কোথাও তুমি দেখেছ। সত্যি দেখেছ না কি ?

হ্যাঁ, মাস্টারমশায়, সত্যিই দেখেছি। আমাদের জাহাজ যখন বোম্বাই থেকে একদিনের পথ দূরে তখন আমি আমার ক্যাবিনের সামনে এঁকে দেখতে পাই। একজন ভারতীয় সাধুকে প্রথম শ্রেণীর সামনে ঘুরতে দেখে আমি ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসে এঁর সঙ্গে প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বলি। তারপর ইনি অন্যদিকে চলে গেলেন।

আমি তখন ঐ যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি মনে আছে কবে কোন সময় আপনি বাবাকে সামনে পেয়ে কথা বলেছিলেন।

উত্তরে যুবক যা বললেন, তাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যেদিন সন্ধ্যার একটু পূর্বে যুবকের পাশের কামরায় তাঁর খবর আনতে বাবা গম্ভীরনাথ তাঁর কামরায় ঢুকে চল্লিশ মিনিট দ্বার বন্ধ করেছিলেন। সেইদিন সেই সময়ের মাঝেই বাবার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন হয়েছিল।

এতে বুঝতে কষ্ট হয় না যে বাবা ঐ সময় সূক্ষ্মদেহে তরুণ ব্যারিস্টারের কামরার সামনে হাজির হয়েছিলেন।

গম্ভীরনাথজী এমনি সূক্ষ্মদেহে যত্রতত্র বিচরণ করতে পারেন এ তাঁর অনেক ভক্তেরই জানা ছিল।

*　　　*　　　*

যোগীবর একদিন সন্ধ্যোবেলা মঠে নিজের কামরায় বসে আছেন, সামনে কয়েক জন অন্তরঙ্গ ভক্ত। এমন সময় হঠাৎ বলে উঠলেন, কেউ তোমরা উমেশবাবুর কোন খবর পেয়েছ ? কেমন আছেন তিনি ?

উমেশবাবু বাবার একজন বিশিষ্ট ভক্ত, সপরিবারে তখন হরিদ্বারে। বাবার মুখে এই প্রশ্ন শুনে সবাই ভাবলেন নিশ্চয়ই তাঁর কোন বিপদ হয়েছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, টেলিগ্রাম করে তাঁর সংবাদ জানা হবে কি ?

পরের দিন জিজ্ঞাসা করা হ'লে বললেন, এ জন্য আর ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

কয়েক দিন পর উমেশবাবুর এক চিঠি এল। সেই চিঠিতে জানা গেল যোগীবর যে দিন যে সময়ে তাঁর খোঁজখবরের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, সেদিন সেই সময়ে তিনি ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন। সেই সময় চলন্ত গাড়ির হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়। তাই দেখে কামরার ভিতর থেকে তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেরা সব চীৎকার করতে থাকেন। বাবা দূরে থাকলেও এদের আর্তরব তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছেছিল।

আর একদিনের কথা।

গম্ভীরনাথজী অর্ধবাহ্য অবস্থায় নিজের আসনে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর ধ্যানাবেশ কেটে গেল, চোখ খুলে তিনি ব্যস্ত হয়ে তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, মাস্টারবাবু মঠে ফিরে এসেছেন?

এই মাস্টারবাবু হচ্ছেন প্রসন্নকুমার ঘোষ। যোগীবরের শিষ্য। শিক্ষা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করে গুরুসেবার জন্য মঠে বাস করছেন। ঐদিন রাত্রে তিনি গাড়ি করে মঠে ফিরছিলেন---পথে ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে গাড়িটি উল্টে গিয়ে ভেঙে ফেলে। এভাবে তাঁর জীবন সংশয় হ'লেও সামান্য আঘাতের মাঝ দিয়ে বিস্ময়কর ভাবে সেদিন তিনি নিষ্কৃতি পেয়ে যান।

শ্রীসন্তদাস বাবাজী

সন্ন্যাস নেবার আগে শ্রীসন্তদাস বাবাজীর সংসারাশ্রমের নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী। শ্রীকাঠিয়া বাবার সংস্পর্শে আসবার আগেই আধ্যাত্মিক সাধনার আগ্রহ জাগে মনে। এক ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে জগৎচন্দ্র সেন নামে এক গুরুর কাছ থেকে যোগ শিক্ষা করেন। এতে তাঁর প্রাণের পিপাসা মেটে নি বটে, কিছু কিছু অনুভূতি লাভ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও। এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে তারাকিশোর বলেছেন—

"আমার অবলম্বিত এই সাধনে শক্তি প্রকাশিত হয় এটা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। তা ছাড়া এর দ্বারা এক প্রকার ভাবাবেশ হয়ে থাকে তা বড়ই মধুর—এটাও আমি বহুবার দেখেছি। এই অর্জিত শক্তি দিয়ে আমি শুধুমাত্র দৃষ্টিপাত করে নিজে রোগীকে রোগমুক্ত করেছি। আমার দর্শনমাত্রে হিষ্টিরিয়া রোগীর মূর্ছারোগ দূর হয়েছে, এমনও কখন কখন ঘটেছে, আমাকে স্পর্শ করে অনেকে ভাবাবিষ্ট হয়েছে। মূর্ছিত পর্যন্ত হয়ে পড়েছে, এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।"

* * *

কলকাতা থাকতে তারাকিশোর প্রায় রোজই গঙ্গাস্নান করতেন। গঙ্গাতীরে বসে ধ্যান জপ প্রার্থনা ইত্যাদিতে তাঁর অনেক সময় কেটে যেত। ১৮৯১ সালের কথা। গ্রীষ্মকাল। সন্তপিত চিত্ত নিয়ে গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন তিনি, হঠাৎ তাঁর সারা অন্তর মথিত করে এক প্রবল আর্তি এবং ক্রন্দনাবেগ উঠল। গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে তিনি সখেদে বলতে লাগলেন, মাগো, লোকে তোমায় ত্রিতাপ নাশিনী, কলুষবারিণী বলে জানে। কিন্তু মা, এ অধম কি এতই পাপী যে তোমার ত্রিলোকপাবনী ধারা তাকে শুদ্ধ করতে পারল না?

তারাকিশোরের এ খেদোক্তি শেষ হতে না হতে তাঁর চোখের সামনে এক অলৌকিক দৃশ্য ভেসে উঠল। এর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন—

"দেখলাম আমার চোখের সামনে হিমালয়ের যে স্থান থেকে গঙ্গা উদ্ভূত হয়েছেন, সেই গঙ্গোত্রী গোমুখী স্থান হঠাৎ প্রকাশিত হ'ল এবং সেই স্থানে বিরাজমান উমা মহেশ্বরদেবও আমার দৃষ্টিগোচর হ'লেন। আমি তখন বিস্মিত হয়ে ঐ স্থান ও তাঁদের দেখতে লাগলাম। নমস্কার করতেও ভুলে গেলাম। এরপর মহেশ্বর একটি একাক্ষরী মন্ত্র আমাকে উপদেশ করলেন এবং আরো বলে দিলেন যে, এই মন্ত্র জপের দ্বারা আমি যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ করবো।"

অলৌকিক দৃশ্যটি একটু পরেই মিলিয়ে গেল।

পথপ্রদর্শক সদ্‌গুরু যে তাঁর সত্যি সত্যি মিলবে, এ বিষয়ে তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না। এর তিন বছরের মধ্যেই তাঁর সদ্‌গুরু লাভ হয়। ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ কাঠিয়া বাবা মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনিকৃতার্থ হন।

*　　　*　　　*

তারাকিশোর এবং তাঁর স্ত্রী ঘরের মাঝে তাঁদের গুরুমহারাজ কাঠিয়াবাবার একখানা ছবি রেখেছেন। কিন্তু এ ছবির যে রোজ পূজো করা তাঁদের উচিত এ কথা তাঁদের তেমন মনেও হয় না, জানাও নেই। গুরুকেই তাই এগিয়ে আসতে হল' তাঁদের এ ব্যাপার সমঝিয়ে দিতে। কিছুটা যোগবিভূতি দ্বারা তিনি কার্যটি সাধন করলেন।

তুলারাম নামে তারাকিশোরের একটি চাকর ছিল। লোকটি সরল এবং ভক্তিমান। কাঠিয়াবাবা মহারাজের ছবির সামনে সে রোজ ধূপধুনা দিত, প্রদীপ জ্বালাতো। 'একদিন সন্ধ্যায় সে ছবির সামনে ধূপদীপ দিতে ঠাকুর ঘরে গিয়ে পরক্ষণেই দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তারাকিশোর বাবুর স্ত্রীর সামনে এসে হাজির। একটু

সামলে নিয়ে তার ভয় পেয়ে দৌড়ে আসার কারণটা যা সে বললে তা হচ্ছে এই—

গুরুমহারাজের যে ছবিটা আছে ঠিক তাঁরই মত জটাজুটধারী সাধু হঠাৎ কোত্থেকে তড়িৎ গতিতে এসে তার হাত থেকে ধুনুচিটা কেড়ে নিয়েছেন, যাবার সময় তিনি তিরস্কারের সুরে বলে গেলেন তোরা রোজ সন্ধ্যায় আমার ফটোর সামনে আরতি করিস না কেন ?

খুঁজতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও এ সাধুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কিন্তু অনেক রাত্রে দেখা গেল তুলারামের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সেই ধুনুচিটি জলের চৌবাচ্চায় কোনে পড়ে রয়েছে।

বলা বাহুল্য এরপর থেকে বাড়িতে কাঠিয়াবাবার ছবির সামনে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত আরতি ও গুরু স্তব হতে থাকে।

* * *

গুরুমহারাজ কঠিয়াবাবার কৃপায় একবার তারাকিশোরবাবুর প্রাণরক্ষা হয়। পরে এ কাহিনীটি তিনি অনেককে শুনিয়েছেন।

শ্রীহট্টের ব্যাপার। হাতীতে চড়ে তিনি তাঁর শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছেন। একটা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে হাতী বেশ দ্রুত চলেছে, হঠাৎ সে আরও দ্রুত চলতে লাগল। তারাকিশোর দেখলেন তাঁরা একটা বড় গাছের সামনে এসে গেছেন। ঐ গাছের দস্তুর মত বড় একটা ডাল যাবার পথে এমন নীচু হয়ে আছে যে আর একটু এগুলেই তাঁর দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

এই সময়ই ঘটে গেল এক অলৌকিক ব্যাপার। তারাকিশোরকে পিঠে নিয়ে হাতীটি কি করে যে ঐ বিপজ্জনক স্থান পার হয়ে গেল তারাকিশোর তা বুঝবারই সুযোগ পেলেন না। পিছনে নজর পড়লে দেখলেন বৃক্ষ শাখাটি ঠিক আগেকার মতই নীচু হয়ে আছে। হাতী কি করে যে এটা এড়িয়ে এল,—কোন বিচার বিশ্লেষণের দ্বারাই তিনি সে রহস্য ভেদ করতে পারলেন না।

এর কয়েক দিন পরের কথা। তারাকিশোর বৃন্দাবনে এসেছেন, গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে আছেন। মনে কোন প্রশ্ন নেই,

তাই মুখেও কোন কথা নেই। হঠাৎ কাঠিয়াবাবা মহারাজ তাকে বলে উঠলেন, বেটা, গাছের ডাল কি করে তোমার জীবনান্ত ঘটাবে ভগবান যে সব সময়েই ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকছেন, তোমায় রক্ষা করে যাচ্ছেন।

*　　　*　　　*

সেবার তারাকিশোর গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবেন স্থির করে ফেলেছেন। সহধর্মিণী অন্নদাদেবী কোনদিনই স্বামীর আধ্যাত্মিক সাধনায় অন্তরায় হ'ন নি, সন্ন্যাসেও তিনি সম্মতি দিয়েছেন। সুতরাং গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হ'তে এখন আর কোন বাধা না থাকায় সব কিছুর ব্যবস্থা করে তারাকিশোর বাবু নিশ্চিন্ত হ'লেন।

কিন্তু রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়েই তিনি একেবারে স্তম্ভিত। দেখলেন দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সামনে দাঁড়িয়ে মধুর হাসি হাসছেন, সারা ঘর স্নিগ্ধ স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত। সেদিনকার সেই অলৌকিক দর্শনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাকিশোরবাবু নিজে লিখেছেন—

"তখন আমার হৃদয়ে অনির্বানীয় আনন্দ স্রোত বহিতে লাগিল, সমস্ত জগৎকে আনন্দময় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। অবশভাবে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শ্রীভগবানকে সাস্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম তিনি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। আমার অন্তরে আনন্দ-স্রোত তখনও বইতে লাগিল, কয়েক দিনই সেই স্রোত চলিয়াছিল। সংসার দুঃখময়, অতএব পরিত্যাজ্য, বোধ হওয়াতে আমার যে তীব্র বৈরাগ্য আসিয়াছিল, সমস্ত সংসারকে আনন্দময়রূপে দর্শন করিয়া আমার সেই ভাব আর রহিল না। বরঞ্চ আমার শয়নকক্ষেই যে তিনি দর্শন দিয়াছেন, ইহাতে আপাততঃ আমার সংসারে অবস্থানই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইবার ইচ্ছাও ইহার ফলে তিরোহিত হইয়া গেল এবং পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।"

কয়েক মাস পরে তারাকিশোরবাবু বৃন্দাবন গিয়ে কাঠিয়াবাবার

চরণ বন্দনা করে যখন তাঁকে এই অলৌকিক দর্শনের কথা জানালেন তখন তিনি খুশী হয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বললেন, 'ইয়ে দর্শন বহুৎ ভাগসে মিলতা হ্যায়। লেকিন ইয়ে দর্শন ছায়াদর্শন হ্যায় ইসকে পিছে ঔরভী দর্শন হ্যায়।'

*　　　　*　　　　*

উজ্জয়িনীতে সেবার কুম্ভমেলা। সে মেলাতে সন্তদাসজী উপস্থিত হতে পারেন নি, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছেন তাঁর শিষ্য অনন্তদাস। বাবাজী মহারাজের ছত্রের নীচে তাঁর আসনটি পেতে রাখা হয়েছে, আর তার পাশে বসেছেন অনন্তদাস। সন্তদাসজীর আর-আর ভক্তশিষ্যর সঙ্গে ভক্ত সুরেন্দ্র বসু মশাইও সস্ত্রীক মেলায় এসেছেন। হঠাৎ দেখা গেল সুরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী বাবাজীর ছাতার নীচে বসে অঝোরে কাঁদছেন। কি ব্যাপার—ব্যস্ত হয়ে সবাই তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। মহিলাটি কিছুটা শান্ত হবার পর সবাইকে খুলে বললেন, ছাতার নীচে বাবাজী মহারাজের আসনটি শূন্য কেন—তাঁর মনে হয় বাবা এ সময় এখানে হাজির থাকলে কি আনন্দই না হত, স্নেহভরে আমার মাথায় হাত দিয়ে কত আশীর্বাদই না করতেন। এই কথা মনে হতেই মনের আবেগ চেপে রাখতে না পেরে তাঁর ভীষণ কান্না পেয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন সন্তদাসজী সশরীরে তাঁর নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে স্নেহ ভরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করছেন। এই দৃশ্য দেখেই তিনি কাঁদছিলেন।

*　　　　*　　　　*

সন্তদাসজীর অন্যতম শিষ্যা শ্রীধীরেন্দ্র দাসগুপ্তের স্ত্রীরও এই রকম এক অলৌকিক দর্শন ঘটেছিল। এদের কন্যাটি অসুখে একবার মরণাপন্ন হয়। মহিলাটি তখন অতি ব্যাকুল হয়ে তাঁর গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। এই সময় হঠাৎ দেখেন জ্যোতির্ময় মূর্তিতে সন্তদাসজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। এই দর্শন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"কতক্ষণ আমি বাবাকে দেখিলাম তাহা অন্দাজ করিতে পারিব না। কিছুকাল পর তিনি আমার কন্যার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া অমৃত মাখানো অভয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া ক্রমেই যেন ঘরের দেওয়ালের সাথে মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই দৃষ্টি, সেই রূপ আমার অন্তরে গাঁথা হইয়া আছে। মনে করিলেই আমার সমস্ত শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠে। আমার কন্যাটি ক্রমে রোগমুক্ত হয়।"

শ্রীরামানুজ

শ্রীরামানুজের গুরু আচার্য যাদবপ্রকাশ শুধু শাস্ত্রজ্ঞ ন'ন, মন্ত্রবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী। সেবার কাঞ্চীর রাজকন্যা এক দুষ্ট প্রেতাত্মার প্রভাবে পতিত হ'ন। সাধারণ চিকিৎসকেরা বহু চেষ্টা করেও যখন তাঁর স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় আনতে পারলেন না, রাজা তখন নিরুপায় হয়ে যাদবপ্রকাশের কাছে দূত পাঠালেন।

আচার্য যাদবপ্রকাশ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে রোগিণীর সামনে সাড়ম্বরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন।

প্রেত কিন্তু রাজকন্যার মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত কথা বলে বসল। বললে, ঠাকুর, আমি রাজকন্যাকে ছেড়ে যেতে রাজী আছি যদি তুমি তোমার শিষ্য রামানুজকে আমার শিরে একবার পাদস্পর্শ করতে

দাও। তোমার এ শিষ্যের দেহ বড় পবিত্র, সে এক মহাশক্তিমান বিষ্ণুভক্ত।

রাজকন্যার মুখে প্রেতের এই কথা শুনে যাদবপ্রকাশের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তার ইঙ্গিতে রামানুজ সর্বজন সমক্ষে রোগিণীর মস্তকে চরণ রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগিণী প্রেত মুক্তা হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ঘটনাটি অবশ্য সামান্য, কিন্তু এর দ্বারা রামানুজ কাঞ্চীর রাজসভা এবং জনসমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন।

* * *

রামানুজের খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং পাণ্ডিত্যে ঈর্ষান্বিত আচার্য যাদবপ্রকাশ একবার তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেন। তাঁকে মিষ্টকথায় ভুলিয়ে অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে তীর্থযাত্রার অছিলায় কাঞ্চীনগর থেকে বেরিয়ে পড়েন। আচার্যের অন্যান্য শিষ্যদের মাঝে রামানুজের মাসতুতো ভাই গোবিন্দও ছিলেন।

তীর্থযাত্রীরা চলতে চলতে বিন্ধ্যপ্রদেশের গোণ্ডা অরণ্যে এসে হাজির হ'ল। এই দূর বিস্তারী গহন অরণ্যে জনমানবের বসতি নেই, নানা হিংস্রজন্তুর আবাসস্থল। আচার্য তার অনুগত শিষ্যদের নিয়ে একান্তে বসে ঠিক করলেন—এই অরণ্যেই রামানুজের প্রাণনাশ করতে হবে। শেষে রটিয়ে দিলেই চলবে কোন নরখাদক জন্তুর হাতে পড়ে তাঁর জীবনান্ত হয়েছে।

পরামর্শটা গোপনে হ'লেও ভাগ্যক্রমে রামানুজের মাসতুতো ভাই গোবিন্দের এ কথা কানে যায়। দিনান্তে কাছেরই এক জলাশয়ে রামানুজ যখন হাত পা ধুতে গিয়েছেন—তখন গোবিন্দ তাঁকে একান্তে পেয়ে এ ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলেন।

গোবিন্দের অনুরোধে রামানুজ সেই মুহূর্তে গুরুসঙ্গ ত্যাগ করে বনপথে দক্ষিণদিকে ছুটলেন। কাঞ্চীনগর দক্ষিণে।

রাত্রিতে রামানুজের খোঁজ করে যখন পাওয়া গেল না, তখন

যাদবপ্রকাশ এবং তাঁর অনুগত শিষ্যেরা ধরে নিলেন রামানুজ কোন ব্যাঘ্রের কবলেই পড়েছেন।

এদিকে রামানুজ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনের ভিতর দিয়ে দ্রুত পায়ে দক্ষিণে ছুটেছেন। বেশ কিছু দূর যাবার পর রাত্রিটা তিনি এক বৃক্ষশাখায় বসে কাটালেন। ভোর হ'লেই আবার যাত্রা সুরু। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত দ্রুতপদে পথ চলে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তাছাড়া ক্ষুৎপিপাসায়ও অতি কাতর। একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নেবার পর অচেতন হয়ে পড়লেন তিনি।

বেলা শেষে চেতনা ফিরে এলে তিনি অনুভব করলেন তাঁর শ্রান্তিক্লান্তি আর কিছুমাত্র নেই। তা ছাড়া আর এক বিচিত্র ব্যাপার। কোত্থেকে এক ব্যাধদম্পতি এসে তাঁর পরিচর্যা করল। এ গভীর অরণ্যে দুটি মনুষ্যমূর্তি দেখে আশ্বস্ত হ'লেন রামানুজ।

তিনি ধীরে উঠে বসলেন—ব্যাধপত্নী তাঁকে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ বাবা, তুমি কে বলো ত, এ ঘোর বনে যে ডাকাতরাও আসতে ভয় পায়, তুমি কোত্থেকে এলে, যাবেই বা কোথায়?

মা, আমি বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণসন্তান, তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু সঙ্গীদের শত্রুতায় আমায় পালিয়ে আসতে হ'ল। আমি কাঞ্চী নগরে যাব, তোমরা দয়া করে আমায় পথ দেখিয়ে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধ বলে উঠল, ভালই হ'ল, আমরাও ত কাঞ্চী নগরেই যাচ্ছি, চলো এক সঙ্গে যাওয়া যাক।

ব্যাধ দম্পতির দেওয়া কিছু ফলমূল খেয়ে তাদেরই সঙ্গে রামানুজ পথ চলতে সুরু করলেন।

সূর্যাস্তের পর অন্ধকার নেমেছে বনে, গাঢ় অন্ধকার। সে অন্ধকারে রাত্রে পথ চলা আর হ'ল না, সবাই বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

রামানুজ নিদ্রার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় অদূরে শায়িত ব্যাধ দম্পতির কথা তাঁর কানে এল। ব্যাধ রমণীর তেষ্টা পাওয়ায় সে তার স্বামীকে বলছে, ওগো, বড় তেষ্টা পেয়েছে আমার, কাছেই

ত সেই নাম-করা কুয়ো, কিছুটা জল আনো, তেষ্টা মেটাই।

স্বামী তাকে বোঝাচ্ছে, রাত্রের আঁধারে আর কোথায় ছোটাছুটি করব, একটু সহ্য করে থাকো, ভোর হ'ক, তখন জল এনে দেব।

তাদের এই কথাবার্তা শুনে উঠে বসলেন রামানুজ: যে স্নেহময়ী নারী ক্লান্তি অবসাদের সময় দরদ দিয়ে তাঁকে সেবা করেছে, ক্ষুধায় ফলমূল যুগিয়েছে, তারপর সঙ্গিনী হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার তেষ্টা পেয়েছে, জল মিলবে না— এ কি কথা? হোক রাত্রি, হোক অন্ধকার তিনিই তার তেষ্টার জল এনে দেবেন।

ব্যাধ দম্পতির কাছে গিয়ে রামানুজ কূপের খোঁজ করলেন। তারা দুজনেই বলে উঠল, বাবা, এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই, কা'ল সকালে আনলেই চলবে।

রামানুজ ভোরে উঠে ব্যাধদম্পতির কাছ থেকে কুয়ো কোথায় জেনে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন শালকুঞ্জের মাঝে মস্ত বড় এক কুয়ো। বহু লোক জল নিচ্ছে। তিনি হাতমুখ ধুয়ে অঞ্জলি ভরে সেখান থেকে জল এনে ব্যাধ পত্নীকে পান করাতে লাগলেন। তিনি তিনবার জল এনে তাকে পান করালেন, কিন্তু তবু তার তেষ্টা গেল না। আরও একবার জল আনতে গেলেন তিনি, কিন্তু এবার ফিরে এসে দেখেন সে ব্যাধও নেই, ব্যাধপত্নীও নেই। ছোটাছুটি করে চারিদিকে খুঁজলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই মিলল না।

এরপর রামানুজ কূপের কাছে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ জায়গাটার নাম কি, কাঞ্চী এখান থেকে কতদূর?

রামানুজের কথা শুনে তাঁর চারিদিকে লোকের ভিড় জমে গেল। কয়েকজন তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, সে কি ঠাকুর, তোমাকে কি ভূতে পেয়েছে? আচার্য যাদবপ্রকাশের ছাত্র না তুমি? এতদিন কাঞ্চীতে থেকেও তুমি কাঞ্চী চিনতে পারলে না? ঐ ত বরদরাজের মন্দিরের চূড়া, আর এ কূপ হচ্ছে মহাতীর্থ শালকূপ, অথচ তুমি কিছুই চিনছ না দেখছি। মাথা তোমার নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে।

শুনে রামানুজ হতবাক্, সারা দেহে পুলকরোমাঞ্চ। সুদূর বিন্ধ্যারণ্য থেকে মাত্র এক অপরাহ্ণে হেঁটে কি করে তিনি কাঞ্চীনগরে এসে হাজির হ'লেন? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুঝতে বাকী রইল না, যে ব্যাধ দম্পতির জন্যই এ তাঁর হতে পেরেছে। ছদ্মবেশে স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি আর লক্ষ্মীদেবীই তাঁকে আশ্রয় দিয়ে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছেন।

* * *

শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথজীর নিত্যসেবক, দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুভক্তদের মধ্যমণি বৃদ্ধ যমুনাচার্য বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শেষের দিন এগিয়ে আসছে বুঝে তরুণ ভক্ত রামানুজকে একবার কাছে আনবার জন্য তিনি তাঁর প্রিয়-শিষ্য মহাপূর্ণকে পাঠালেন। কাঞ্চী দূরের পথ। যাতায়াতে সাড় আট দিন ব্যয় করে মহাপূর্ণ যখন রামানুজকে নিয়ে শ্রীরঙ্গমে এসে হাজির হ'লেন তখন কাবেরীর অপর তীরে দেখা গেল এক বিরাট জনতা। জনতার কাছে গিয়ে দু'জন দেখলেন এক মর্মান্তিক দৃশ্য। রামানুজকে কাছে পাবার আগেই মহাপুরুষ যমুনাচার্য দেহত্যাগ করেছেন।

তাঁর নিষ্প্রাণ দেহের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন শোকাহত রামানুজ, এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল মহাপুরুষের ডান হাতের তিনটি আঙুল মুষ্টিবদ্ধ। এ কেন? ভাবতে লাগলেন রামানুজ: তবে কি দেহত্যাগের প্রাক্‌কালে মনে কোন বিশেষ সংকল্প উদিত হয়েছিল মহাপুরুষের মনে? এ বৃদ্ধাঙ্গুলি কি তারই সংকেত?

এই ভাবার সঙ্গে সঙ্গে এক দিব্যভাবের প্রেরণা জাগল তাঁর মনে। তিনি বিগতপ্রাণ যমুনাচার্যের দেহের দিকে চেয়ে তাঁরই উদ্দেশ্যে এক সঙ্কল্পবাণী উচ্চারণ করলেন। সে বাণীর মর্ম হচ্ছে এই—বৈষ্ণবমতে দৃঢ় নিষ্ঠা রেখে আমি অজ্ঞানমোহিত জনগণকে করব পঞ্চসংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড়বেদে শিক্ষিত, আর শ্রীনারায়ণে শরাণগত জনের করব সর্বপ্রকারে রক্ষা।

...কক ব্যাপার! এই বাণী উচ্চারিত হবার সঙ্গে

সঙ্গে মৃতের বদ্ধমুষ্টি থেকে একটি অঙ্গুলি সোজা হয়ে খুলে গেল।

ভাবতন্ময় রামানুজ আবার একটি শ্লোক রচনা করে গেয়ে উঠলেন, লোকহিতায় রচনা করব আমি শ্রীভাষ্য, যা হবে সর্বার্থ-সংগ্রহ, কল্যাণকর ও তত্ত্ব জ্ঞানের বাহক?

এরপর মৃত যামুনাচার্যের আর একটি আঙ্গুলি খুলে গেল।

অতঃপর রামানুজের কণ্ঠে ধ্বনিত হল শ্লোকবদ্ধ তাঁর তৃতীয় সংকল্প বাক্য: যে কৃপাময় পরাশর মুনি জীবোদ্ধারের জন্যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি-সম্বলিত বিষ্ণুপুরাণ রচনা করে গিয়েছেন, কোন মহাপণ্ডিত বৈষ্ণবকে করব আমি তাঁরই নামে অভিহিত।

আশ্চর্য কাণ্ড! এই শ্লোক উচ্চারিত হবার পর দেখা গেল যামুনাচার্যের তৃতীয় বদ্ধাঙ্গুলিও সরল হয়ে গিয়েছে।

চোখের সামনে এই আলৌকিক ব্যাপার দেখে সমাগত ভক্ত দর্শকদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কে এই মহাশক্তিধর তরুণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সমাজের নেতা যমুনাচার্যের সঙ্গে কেন তাঁর এই আত্মিক যোগাযোগ? অল্প সময়ের মাঝেই রামানুজ শ্রীরঙ্গম্ অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন।

* * *

রামানুজ তাঁর প্রিয় শিষ্য অনন্তাচার্যকে একবার পবিত্র তীর্থ শ্রীশৈলে (তিরুপতিতে) গিয়ে বাস করবার আদেশ দিলেন। গুরুর সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে মন চায় না। তবুও গুরু যখন আদেশ করেছেন তখন আর দ্বিরুক্তি না করে তিনি সস্ত্রীক সেখানে গিয়ে ঈশ্বর-আরাধনায় মনোনিবেশ করলেন।

সে অঞ্চলে তখন বড় জলাভাব। জলাভাবে ওখানকার লোকের দুর্দশা দেখে তিনি স্থির করলেন—লোকের জলকষ্ট দূর করতে তিনি নিজের হাতেই ওখানে এক জলাশয় খনন করবেন। এ কাজ তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনারই এক অঙ্গ বলে ধরে নিলেন।

অনন্তাচার্য নিজে রোজ কোদাল দিয়ে মাটি কেটে এক ঝুড়িতে

রাখেন, আর সে ঝুড়ি তাঁর স্ত্রী মাথায় করে বয়ে নিয়ে যান। এমনি করে শুধু দিনের পর দিন নয়, মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে যায়।

এর মাঝে আচার্যের সহধর্মিণী আসন্নপ্রসবা হয়েছেন। মাটির বোঝা বইতে তাঁর বড় কষ্ট হয়। কিন্তু কি করা যায়, কোন উপায় নেই, ভাবলেন আচার্য, কাজ বন্ধ করা হবে না।

সেদিন আচার্যপত্নী বড্ড বেশি ক্লান্তিবোধ করছিলেন। মাটির ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে উপরে উঠলেন। উপরে মস্ত বড় একটা বটগাছ চারিদিকে শাখা মেলেছে। আচার্য-পত্নী তার ছায়ায় একটু বিশ্রাম নিতে বসলেন। এমনি করে বিশ্রাম করতে গিয়ে কখন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন—হুঁস নেই।

এদিকে আচার্য দেখছেন স্ত্রী তাঁর আগের মতই বোঝা বয়ে চলেছেন, কিন্তু আগের মত মন্থরগতি আর তাঁর নেই, বরং কি করে যেন প্রাণশক্তি ফিরে পেয়ে আগের চেয়ে বেশি কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন।

আচার্য তা দেখে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, ব্রাহ্মণী, আজ যে তোমার তাকত অনেক বেড়ে গিয়েছে দেখছি!

কর্মরতা নারীমূর্তি ঝুড়ি মাথায় রহস্যময় এক হাসি হেসে চলে গেল। অনন্তাচার্যের চোখে ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। কোদাল রেখে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলেন তিনি। এসে সবিস্ময়ে দেখেন তাঁর স্ত্রী ক্লান্ত দেহ বৃক্ষছায়ায় এলিয়ে দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

স্ত্রীকে জাগিয়ে দিয়ে আচার্য ছুটে গিয়ে মৃদুহাস্যময়ী কর্মরতা নারী মূর্তিটির পথরোধ করে দাঁড়ালেন: মায়াবী, এ কি নিষ্ঠুর খেলা খেলতে এসেছ তুমি আমাদের সঙ্গে? আমরা তোমার সামান্য কিঙ্কর, তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি, আমাদের সে সৌভাগ্য, সে আনন্দও তুমি হরণ করতে চাও? তা ত হতে দেব না, প্রভু।

আচার্যের মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই নারীমূর্তি রহস্যময় হাসি হেসে কোথায় মিলিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আচার্য-

দম্পতির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পরম সুন্দর এক বিষ্ণুমূর্তি। ভক্ত দম্পতিকে আশীর্বাদে ধন্য করে সে মূর্তিও আবার তখনই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

রামানুজ-শিষ্য অনন্তাচার্যের সৃষ্টি এই জলাশয়টি আজও তিরুপতিতে বিদ্যমান। লোকে একে অনন্ত-সরোবর বলে। পুণ্যকামী নরনারীরা এ সরোবরের জল স্পর্শ করে নিজেদের ধন্য মনে করে।

স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী

ভাস্করানন্দজী তখন কাশীতে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র তখন মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যান, গিয়ে নানা ধর্মালোচনা করেন। একদিন এই অলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি স্বামীজীকে বললেন, আপনাকে প্রায়ই বলতে শুনি, এ জগৎ নিতান্তই অলীক, মায়া ছাড়া এ আর কিছু নয়, কিন্তু আপনার চরণ স্পর্শ করবার সময় ত তা আমাদের মনে হয় না।

এই কথা বলেই স্যর রমেশচন্দ্র ভাস্করানন্দ মহারাজের চরণ স্পর্শ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—পা থেকে হাত উঠাতে না উঠাতেই দেখেন স্বামীজীর স্থূল দেহটি আর সেখানে নেই।

একটু পরেই স্বামীজী স্থূল দেহে সেখানে আবার আবির্ভূত হয়ে স্যর রমেশচন্দ্রকে বললেন, এবার বুঝতে পারলে তো? সব কিছু অলীক না হ'লে আমি এই আছি, এই নেই, এ কি করে হয়?

এই কথা বলার পর তিনি দ্বিতীয়বার আবার রমেশচন্দ্রের সামনে থেকে অন্তর্হিত হ'লেন। তারপর আবার স্বস্থানে স্থূল শরীরে আবির্ভূত হয়ে জাস্টিস মিত্রকে বললেন, কি বলো, রমেশ, জগৎ স্বপ্নের মত অলীক,—এ কথায় এখনও অবিশ্বাস আছে তোমার?

* * *

ভারতের তদানীন্তন কমাণ্ডার ইন চীফ স্যর উইলিয়ম লকহার্ট ভাস্করানন্দজীকে বড় শ্রদ্ধা করতেন। তিনি মাঝে মাঝে সস্ত্রীক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একবার স্বামীজী তঁার এক অদ্ভুত যোগ বিভূতির-সাহায্যে সাহেবের চৈতন্যোদয় করেন। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে স্বামীজীর এক পুরানো ভক্ত তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে তার এই বর্ণনা দিয়েছেন -

"সেনাপতি যেদিন স্বামীকে দর্শন করিতে আসেন সেইদিন সেই সময়ে আমি আনন্দবাগে উপস্থিত ছিলাম। স্বামীজীর নিকট লকহার্ট সাহেব বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। আমরাও সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

গল্প করিতে করিতে যে সময় সহসা সাহেবের মনে অহংকার আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় স্বামীজীর নিকট একটি পেনসিল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐ পেনসিলটি তুলিয়া লইবার জন্য লকহার্ট সাহেবকে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! লকহার্ট সাহেব বহু চেষ্টা করিয়াও পেনসিলটি তুলিতে পারিলেন না। তখন স্বামীজী বলিলেন, তুমি যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ এরূপ ভাবিও না। জয়পরাজয়ের কর্তা কেবল একজন আছেন। আমি যেমন তোমার শক্তি হরণ করিয়াছি, তিনিও ঐভাবে তোমার বুদ্ধি

হরণ করিতে পারিতেন; তাহা হইলে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া তুমি শত্রুদের পরাজিত করিয়াছ, ঐ প্রকার বুদ্ধি তোমার মনে যুদ্ধজয় কালে কখনই উপস্থিত হইত না। ঈশ্বরের উপরই সর্বদা নির্ভর করিবে।"

* * *

ডাঃ ঈশ্বর চৌধুরী কাশীর একজন নামকরা হোমিওপাথ। তাঁর বালক পুত্রের একবার এক কঠিন ব্যাধি হয়। বিজ্ঞানসম্মত যত রকম চিকিৎসা আছে—পুত্রের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য তার কোনটিই বাদ যায় না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হতে থাকে।

অনন্যোপায় হয়ে ডাঃ চৌধুরী তখন ভাস্করানন্দ মহারাজের শরণ নেন। স্বামীজী তাঁর আনন্দবাগের আশ্রমে ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন। ডাঃ চৌধুরীর কাতর প্রার্থনায় তাঁর দয়া হ'ল। তিনি তখন হাত বাড়িয়ে তাঁর পাশের ঝুড়ি থেকে একটা ফল বের করে ডাঃ চৌধুরীর হাতে দিয়ে বললেন, এটা এখনই গিয়ে রোগীকে খাইয়ে দিন।

বলা বাহুল্য ফলটি খাওয়ানোর পর বালকটির সকল সংকট কেটে যায়, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

* * *

তখনকার বঙ্গবাসী কাগজে স্বামীজীর অলৌকিক ক্ষমতার অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়। দু'একটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

"পূর্ববঙ্গের কয়েকটি বাবু একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কয়েকজন প্রণাম করিলে পর আর একটি বাবু যেমন প্রণাম করিতে যাইতেছেন, অমনি স্বামীজী তাঁহাকে প্রণাম করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, তোমার অশৌচ হইয়াছে, পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তুমি প্রণাম করিও না। তুমি এখনই বাটী চলিয়া যাও, বাটীতে তোমার অনাথিনী মাতা যারপর নাই শোকে কাতরা। প্রথমে তাঁহাদের এ কথায় বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু ঐ বাবুটি যেমন

বাসায় ফিরিলেন অমনি দেখিলেন দরজার কাছে তার-পিওন দাঁড়াইয়া হাতে টেলিগ্রাম: "তোমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, অবিলম্বে বাটী আসিবে।"

"সুখীরপুর নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ স্বামীজীর নিকট ব্যাধির আরোগ্য কামনায় উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তির শরীর অতিশয় কৃশ ছিল, যাহা খাইত তাহাই হজম হইত না। স্বামীজী আগন্তুককে দেখিবামাত্র তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'পাঁড়েজি, ভোজন প্রস্তুত কর।' আদেশমত সে ব্যক্তি খিঁচুড়ি রাঁধিয়া স্বামীজীর কণিকামাত্র প্রসাদ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।"

* * *

অযোধ্যার রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ স্বামীজীর এক বিশিষ্ট ভক্ত, অনুগৃহীতও বটে। গুরুদেবের চরণ দর্শন করতে কাশী এসেছেন তিনি। হঠাৎ অযোধ্যা থেকে এক তার এল, জরুরী কাজে এখনই তাঁর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন অত্যাবশ্যক। তার পেয়ে ঠিক করলেন তিনি পরের ট্রেনেই অযোধ্যা ফিরে যাবেন। কিন্তু ভাস্করানন্দজী তাঁকে যেতে দিতে কিছুতেই রাজী নন। মহা সঙ্কটে পড়লেন রাজা প্রতাপনারায়ণ। যাবার অনুমতির জন্যে প্রতাপনারায়ণ স্বামীজীকে অনেক অনুনয় বিনয় করলে স্বামীজী বললেন, যদি নিতান্তই যাবার দরকার হয় তবে যে গাড়িতে যাবে বলে ঠিক করেছে তার পরের গাড়িতে যেয়ো।

অগত্যা তাই করাই সাব্যস্ত করলেন রাজা প্রতাপনারায়ণ। পরের ট্রেনে অযোধ্যা রওনা হবার জন্য যখন তিনি স্টেশনে এলেন তখন সেখানে এক সংবাদ শুনে তাঁর ত একেবারে চক্ষুস্থির। তারে খবর এসেছে এর আগে যে গাড়িখানা অযোধ্যার দিকে যায়—অন্য এক গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে সেটা পথিমধ্যে লাইনচ্যুত হয়। ফলে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। স্বামীজীর নিষেধে যদি তিনি যাত্রা স্থগিত না রেখে ঐ গাড়িতেই উঠতেন—তা হ'লে হয়ত তাঁর মৃত্যুও

হ'তে পারত। এই জন্যই স্বামীজী তাঁকে ঐ গাড়িতে যেতে বাধা দিয়েছেন।

*　　　　*　　　　*

রাজা প্রতাপনারায়ণ যখন অযোধ্যা ফিরবার জন্য ছটফট করছেন আর ভাস্করানন্দ মহারাজ তাঁকে যেতে অনুমতি দিচ্ছেন না— তখনকার কথা। জরুরী বৈষয়িক কাজে যেতে না পেরে মন তাঁর স্বভাবতঃই খারাপ হয়ে আছে। সেই সময় তাঁকে অন্যমনস্ক করতে স্বামীজী তাঁকে নিয়ে সন্ধ্যাকালে আনন্দবাগে বেড়াতে বেরুলেন। এই সময় স্বামীজীর মনে একটু রঙ্গ করবার ইচ্ছা জাগল।

বেড়াতে বেড়াতে যখন দুর্গাকুণ্ডের কাছে এসে পৌঁছেছেন তখন স্বামীজী হঠাৎ প্রতাপনারায়ণের কাছ থেকে তাঁর হীরের অঙ্গুরীটি চেয়ে নিয়ে ক্রীড়াচ্ছলে ওটা দুর্গাকুণ্ডের জলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। গুরুদেবকে রাজা বেশ ভালভাবেই জানেন তাই তাঁর এ রহস্যময় আচরণে কিছুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না, তিনি নিরুদ্বেগে তাঁর এক সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

শিষ্যের এ শান্ত আচরণ দেখে খুশী হ'লেন স্বামীজী। বললেন তোমার আংটি এখনই ফিরে পাবে তুমি, তুমি কুণ্ডের যে কোন জায়গায় হাত ডোবাও দেখি।

প্রতাপনারায়ণের মনেও এক চাতুরি করবার ইচ্ছা জেগে উঠল। তিনি কুণ্ডের অপর পারে গিয়ে কুণ্ডের জলে হাত ডুবালেন। এবার যা ঘটল তা দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না ; হাতে তাঁর একসঙ্গে অনেকগুলি হীরের আংটি উঠে এসেছে। দেখতে সবগুলিই তাঁর নিজের অঙ্গুরীর মত।

স্বামীজী হেসে বললেন, নাও এবার নিজের আংটি চিনে নাও।

তা পারলেন না অযোধ্যারাজ ?

স্বামীজী তখন রাজার নিজের অঙ্গুরী তাঁর হাতে দিয়ে বাকীগুলি আবার কুণ্ডের জলে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

মহাযোগীর এ যেন একটা বালকের মত খেলা।

*　　　*　　　*

স্বামীজী মাঝে মাঝে একান্ত বালকের মত মনের আনন্দে তার যোগবিভূতির খেলা দেখাতেন।

একবারকার কথা। কয়েকজন সন্ন্যাসী এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করতে করতে তিনি একখানা শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে বসলেন। পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেলা হয়ে গেল অনেক। স্বামীজীর হঠাৎ খেয়াল হ'ল তাইত এ সন্ন্যাসীদের ত এখনও খাওয়াদাওয়া হয় নি। এরপরই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সবাইকে খাওয়ানোর জন্যে।

স্বামীজীর বিশিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন সেদিন সেখানে। ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। তিনি লিখেছেন —

"সর্বদর্শী স্বামীজী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিছু খাবে না? আমরা উত্তর করিলাম যে তিনি আমাদের এতজনের উপযুক্ত আহার কোথায় প্রাপ্ত হইবেন? স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, অচ্ছা, তোমরা আহারে বস, এখনই তোমাদের আহার উপস্থিত হইবে। তোমরা কোন কোন দ্রব্য খাইতে চাও আমাকে বল।"

ইহা শুনিয়া আমাদের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন, 'আমরা রাবড়ী, ক্ষীর, দধি, ছানা, সন্দেশ, আম ও কমলা লেবু ভোজন করিব।'

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমরা সকলে দেখিতে পাইলাম দুইটি সুন্দর বালক আমাদিগের দিকেই আগমন করিতেছে। বালক দুইটি আসিয়া তাহাদিগের মস্তকাস্থিত ঝুড়ি দুইটি স্বামীজী পদতলে স্থাপন করিয়া মুহূর্ত মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা য যে খাদ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বালক দুইটি কেবলমাত্র সেই কয়েকটি দ্রব্যই আনয়ন করিয়াছিল।"

বামাক্ষেপা

তারাপীঠের মন্ত্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক বামাক্ষেপা, পুরো নাম রামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পাশেই আঁটলা গাঁয়ে বাড়ি। বাড়িতে থাকেন ছোট ভাই রামচরণ। বাপ আগেই গত হয়েছেন, এবার মা মারা গেলেন। দারিদ্রের সংসার। রামচরণ ভেবে আকুল মায়ের শ্রাদ্ধ কার্যটি কি করে হবে, দাদা ত সংসারের ধার ধারেন না, সংসার দেখেন না।

রামচরণের দুশ্চিন্তার কথা বামাচরণের অজানা রইল না, তিনি ভাইকে অভয় দিয়ে বললেন, ভাবিস নে, রামা, তুই আয়োজন কর, নিমন্ত্রণ কর, মায়ের শ্রাদ্ধের কোন ত্রুটি হবে না, কোন ভয় নেই, আমার তারা মা আছেন।

ভয় তবু যায় না রামচরনের। ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন এসে গেল আর রামচরণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন আশেপাশের গাঁ থেকে অজস্র সাক বহু জিনিসপত্র বয়ে বাড়িতে দিয়ে যেতে লাগল। অপ্রত্যাশিত ভাবে তারাপীঠ থেকে বামাচরণ নিজেও বাড়িতে এসে হাজির হলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা যেমন বেশি, আয়োজিত দ্রব্যের পরিমাণও তেমনি প্রচুর।

সে ত হ'ল, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে যে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। বর্ষার ঘন মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে, বাতাসে আসন্ন বৃষ্টির আভাস। সবাই বলছে এ মেঘে বৃষ্টি না হয়ে যায় না। রামচরণ কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, বিধাতার এ কি বাদ, তীরে এসে শেষে তরী ডুবল, ও দাদা, কি হবে ?

বামাচরণ নির্বিকার, তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, ভয় করিস না, আমার তারা মা আছেন, যার ভাবনা সেই ভাববে। রামচরণের ভয় তবু যায় না। বামাচরণ তখন উদাত্ত কণ্ঠে তারা মায়ের ধ্যান-মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। মেঘের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু উপস্থিত সকলে তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল শ্রাদ্ধ-বাসরের অনতিদূরে আঁটলা মৌজার বিস্তৃত মাঠ বৃষ্টির জলে ভেসে যাচ্ছে অথচ শ্রাদ্ধবাসরে বা তার চারিপাশের জায়গায় এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই।

গুরু কৈলাসপতি বাবা দেখলেন তাঁর শিষ্য বামাচরণ এবার সত্যি সত্যিই সিদ্ধিলাভ করেছেন।

*　　*　　*

বামদেবের তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা, অলৌকিক যোগ-বিভূতির কথা, লোকমুখে চারিদিকে প্রচারিত হলে, শুধু আশেপাশের গাঁ থেকে নয়, বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে তাদের মনস্কামনা পূরণ করবার আশায়, নিজেদের সাধ্যমত ইচ্ছামত প্রণামী দিয়ে যায়। বামদেব নিজের হাতে তা গ্রহণ করেন না, রাখে মন্দিরের পাণ্ডারা।

বামদেবের ছোট ভাই রামচরণের মৃত্যু হয়েছে, তাঁর বিধবা স্ত্রী কয়েকটি কন্যাসন্তান নিয়ে বিপন্ন। মাঝে মাঝে তিনি মন্দিরে আসেন কিছু সাহায্য প্রত্যাশা করে, পাণ্ডারা বামদেবের প্রণামীর টাকা থেকে কিছু কিছু দিয়ে দেয়। একবার এই রকম দিতে গিয়ে তারা দেখে নগেন নামে এক পাণ্ডা এই সব টাকা আত্মসাৎ করেছে।

এখন এই নগেন পাণ্ডা বামদেবের নিত্য সঙ্গী। তান্ত্রিক বামদেব

কিছুটা গঞ্জিকা সেবন এবং কারণবারি-পান করেন, নগেন পাণ্ডা প্রসাদ পায়। গঞ্জিকা আর কারণের জন্য সামান্যই ব্যয় হয়, বাকী সব যায় নগেনের হাতে। রামচরণের স্ত্রীকে টাকা দিতে গিয়ে না পেয়ে পাণ্ডারা রেগে গিয়ে নাটোর রাজসরকারের কর্মচারীদের জানাতে তারা পুলিশে খবর দিল। পুলিশ এসে নগেন পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করে সদর মহকুমা রামপুরহাট নিয়ে গিয়ে আদালতে অভিযুক্ত করল। আত্মভোলা বামদেব এ সব কোন কিছুরই খবর রাখেন না। নগেন পাণ্ডাকে তিনি নগেনকাকা বলে ডাকেন। গঞ্জিকা সেবনের সময় অন্যদিনের মত নগেন কাকাকে দেখতে না পেয়ে রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠলেন: কই আমার নগেনকাকা কই, কোথায় গেল নগেনকাকা?

উপস্থিত সকলে তখন তাঁকে বললে, নগেন আপনার টাকা চুরি করেছে বলে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, সে হাজতে আছে, তার বিচার হবে।

শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন বামদেব: আমার টাকা নিয়েছে, আমি বুঝব, পুলিশের তাতে কি?

নদীতে বান ডেকেছে তখন। প্রবল বর্ষায় দ্বারকানদীর দুকূল প্লাবিত করে তার জলরাশি অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। লোকজন বিস্ময় স্তম্ভিত হয়ে দেখল উচ্ছ্বসিত জলরাশির উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে হেঁটে যাচ্ছেন বামদেব, অতি তীব্র তাঁর গতিবেগ। যাঁরা সাধনরাজ্যের খবর রাখেন তাঁরা জানেন অষ্টবিভূতির অন্যতম লঘিমার সাহায্যে সিদ্ধযোগীদের পক্ষে এটা সম্ভব। নদী পার হয়ে দ্রুত বেগে ছুটলেন তিনি রামপুরহাটের দিকে। হাকিমকে বলে সেই দিনই নগেন পাণ্ডাকে খালাস করে আনলেন তিনি আদালত থেকে। খালাস করবার সময় নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বশিত্ব বিভূতি প্রয়োগ করেছিলেন।

* * *

একবার শহর থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল যুবক এসেছে দেখতে বামদেব কেমন। এসে দেখে একপাত্র থেকে এক কুকুরের সঙ্গে একত্রে প্রসাদ খাচ্ছেন বামদেব। দেখে তাচ্ছিল্যের ভাব জেগে উঠল তাদের মনে, নানা উপহাস করতে লাগল তারা।

বামদেব মৃদু হেসে ওদের নেতাকে কাছে ডেকে তাঁর ডান হাতটা নেতার মেরুদণ্ডের উপর বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে যুবকটির দেহ থর থর করে একবার কেঁপে উঠল, এরপর অবাক বিস্ময়ে দেখল তাদের দলের সবাই এক একটি জন্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে, কেউ হয়েছে শেয়াল, কেউ কুকুর, কেউ সাপ, আর কেউ শকুনি, আর যে কুকুরটির সঙ্গে তিনি একত্রে প্রসাদ খাচ্ছিলেন সে হয়ে গেছে একটা মানুষ। এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সে তার সংজ্ঞা ফিরে পাবার পর বামদেব সস্নেহে শান্তকণ্ঠে বললেন, আমরা সর্বজীবের মাঝেই শিবকে দেখি। সর্বভূতে একই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। অবিদ্যের দ্বারা তোদের মন আচ্ছন্ন বলে এ তোরা দেখতে পাস না। কখনও কোন প্রাণীকে ছোট বলে ঘৃণা করবি না। জন্তুর দেহলাভ করলেও জ্ঞান ছিল তাদের সাবেক সেই মানুষেরই মত। বামদেবের উপদেশ জীবনে আর কোনদিন ভোলে নি যুবকেরা। বামদেব অবশ্য এরপর আবার তাঁর স্পর্শের দ্বারা তাদের মানুষের দেহ ফিরিয়ে দিলেন।

* * *

কামরূপ কামাখ্যা থেকে হঠাৎ এক তন্ত্রসাধক হাজির হ'লেন তারাপীঠে,—সঙ্গে একদল শিষ্য। এসেই তিনি দম্ভের সঙ্গে প্রচার করলেন তাঁর চেয়ে বড় তন্ত্রসাধক দেশে আর নেই। যেদিন এলেন সেইদিন রাত্রিতেই এক চক্রানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন তিনি।

সেদিন অমাবস্যা। অমাবস্যা রাত্রিই চক্রানুষ্ঠানের উপযুক্ত

সময়। আটজনের অনধিক সাধক নিজের নিজের শক্তিকে নিয়ে পৃথক পৃথক আসনে যুগ্মভাবে চক্রাকারে বসে কুলতত্ত্ব, কুলদ্রব্য এবং কুলামৃত সহযোগে ইষ্টদেবতার পূজা করেন। ভৈরবী চক্রেই শক্তির প্রয়োজন, তত্ত্বচক্রে নয়।

চক্র পরিচালনার জন্য একজন সিদ্ধ তান্ত্রিকের প্রয়োজন। একে বলা হয় চক্রেশ্বর। নবাগত কামরূপের সাধকটি বামদেবকে বললেন, আজ রাত্রে আমরা যে চক্রানুষ্ঠান করছি, আপনাকে হতে হবে তাঁর চক্রেশ্বর।

বামদেব বললেন, একবার আমার তারা মাকে শুধিয়ে দেখি, বলেন ত হ'ব।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, ঠিক আছে।

বেশ তা হ'লে পঞ্চতত্ত্ব অনুসারে পানীয় ও ভোজ্যের যোগাড় করুন।

এই কথার পর বামদেব এক হাঁড়ি গলিত শবের পচনশীল মাংস তারা-শোধন করে নিয়ে এলেন। এবার চক্রেশ্বর হিসাবে তিনি যা গ্রহণ করবেন অন্য সাধকদের তারই অবশিষ্ট অংশ প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করতে হবে। বামদেব অবলীলাক্রমে সেই গলিত পচা মহামাংস খেয়ে শোধিত কারণবারি পান করতে লাগলেন।

এবার সাধকদের ঐ মাংস প্রসাদ পাবার পালা। কিন্তু সেই সেই সাধকের বমন সুরু হয়ে গেল। মনে হতে লাগল সারাদিন যা পেটে পড়েছে তা বুঝি এখনই নাড়ী ছিড়ে উঠে আসবে। এখন উপায়? তন্ত্রসাধনায় শোধন করা কোন ভোজ্য-পানীয় অবহেলাও করতে নেই, মাটিতেও পড়তে নেই। বামদেব তখন সাধকের অবস্থা দেখে সঙ্কট বুঝে ছুটে গিয়ে সেই সাধকের মুখ হতে নির্গত সেই বমণ দুই হাতের অঞ্জলিতে ধরে খেয়ে ফেললেন নির্বিকারে।

কামরূপের সাধকটি আর তখন স্থির থাকতে পারলেন না, মনের সকল অহংকার বিসর্জন দিয়ে বামদেবের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনি মহাসাধক, আমি চিনতে পারিনি।

নিজগুণে আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি আপনার দাসানুদাস।

বামদেব কোন উত্তর না দিয়ে তারা তারা বলে সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারাপীঠের শশ্মানের পবিত্র ধুলি মাথায় নিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে নীরবে বিদায় নিলেন শিষ্য-দলসহ কামরূপের সেই তন্ত্রসাধক।

*   *   *

তারাপীঠের শ্মশান-সংলগ্ন গাছপালায় ঝোপে ঝাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে সুরু করেছে এমন সময় কোত্থেকে এক সাধু এসে বামদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, আমায় বাঁচান। আপনি ছাড়া কেউ আর আমায় বাঁচাতে পারবে না।

তিনদিন আগে সাধুটি যখন ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করছিল তখন এক জ্যোতিষী তাকে বলে তিন দিন পরে সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হবে। প্রাণভয়ে এ নিবারণের উপায় সে যার কাছেই জিজ্ঞাসা করেছে সেই বলেছে তাকে তারাপীঠে বামদেবের কাছে যেতে। তাই তার এখানে আসা। সাধুটি সবে সাধন সুরু করেছে, উচ্চমার্গে এখনও উঠতে পারেন, তাই মৃত্যু-ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত।

কেউ এসে রোগ সারানো বা প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করলেই বামদেব প্রথমে রেগে উঠতেন. বলতেন, শালারা ডাক্তারের কাছে যা, আমার কাছে কেন?

সাধুটিরও প্রথমে ঐ রকম শুনতে হ'ল, কিন্তু তার কাতর প্রার্থনায় অবশেষে বামদেবের মনটা কিছু নরম হ'ল। তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, এখনই এই দ্বারকা নদী থেকে এক কমণ্ডলু জল নিয়ে আয়, দেরী করবি না একটুও। সামনেই ঘাট পাবি।

যেতে ভয় করতে লাগল সাধুটির কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, ঘাটে যাবার পথের দুধারে আগাছার ঘন জঙ্গল। মনে হতে লাগল তার মৃত্যুর সময় এগিয়ে এসেছে এবং তা রোখা যাবে না বুঝেই এই আদেশ দিলেন বামদেব। যে পথে তাকে

ঘাটে যেতে হবে তার আশে পাশের জঙ্গলে সাপ থাকা স্বাভাবিক, আর সর্পাঘাতেই তার মৃত্যু। আর আজই সেই দিন।

বামদেব তার মনের ভাব বুঝতে পেয়ে বললেন, যা, যা, বলছি আমি কোন ভয় নেই, যা বললাম আমি তাই করব।

বামদেবের কাছ থেকে অভয় পেয়ে সাধুটি অন্ধকারেই নদীতে গেল এবং এক কমণ্ডলু জল নিয়ে বামদেবের কাছাকাছি আনতেই তার দেহের রক্ত জমে একেবারে হিম হয়ে গেল : সে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কোথেকে একটা কালো বিষধর সাপ মন্থরগতিতে বামদেবের সামনে এসে মাথাটা নাচাতে লাগল। বামদেব তার গলাটা এক হাতে ধরে আর এক হাতে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, নিয়তির নির্দেশে তুই ঠিকই এসেছিস, তোর কোন কসুর নেই, কিন্তু মা ওর জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন তুই ফিরে যা। এই বলেই বামদেব তাঁর হাতটা সরিয়ে নিলেন আর সাপটা অমনি সেখান থেকে ধীর গতিতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

*　　　*　　　*

বামদেব তারাপীঠ থেকে সাধারণত: কোথাও নড়তে চাইতেন না। একবার কলকাতার কয়েকজন ভক্তের পীড়াপীড়ি ধরাধরিতে রাজী হয়ে কলকাতা যাচ্ছিলেন। স্টেশনের কাছাকাছি থেকেই দেখা গেল ট্রেন এসে গেছে। এ ট্রেনটা আর ধরা গেল না ভেবে ভক্তরা চঞ্চল হয়ে উঠল। বামদেব বললেন, কোন ভয় নেই, আমি গাড়িতে না উঠলে গাড়ি ছাড়বে না।

সত্যিই তাই হ'ল। নির্দিষ্ট সময় হয়ে যাবার আধ ঘণ্টা পরও গাড়ি ছাড়ল না, অথচ এর কারণ কি তা কেউ ধরতে পারছে না। আর বামদেব ধীরে সুস্থে গাড়িতে উঠে বসলেই গাড়ি চলতে সুরু করল। যাত্রীরা তখন বলতে লাগল ক্ষেপা বাবাকে নেবে বলেই গাড়ি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

তারপীঠের শশ্মানের ধারেই যে দ্বারকা নদী তার দুই তীরে ঘন শালবন। সেই বনে বাঘ থাকিত। তাই এ অঞ্চলের লোকেরা

রাত্রে বড় একা একা ঘরের বার হ'ত না।

একদিন গভীর রাত্রে বামদেব শ্মশানের পাশে বসে তারা মায়ের ধ্যান করছেন এমন সময় বন থেকে একটা বাঘ এসে তাঁর সামনে ভীষণ গর্জন করতে সুরু করল। গর্জন আর থামে না। ধ্যানের বিঘ্ন হওয়ায় বামদেব চোখ মেলে একবার তার দিকে তাকিয়ে হাতের চিমটে তুলে বললেন, যা, যা, তুই এখান থেকে চলে যা।

বাঘটা অমনি শান্ত বাধ্য শিশুর মত নীরবে সেখান থেকে চলে গেল। যোগীদের যোগবিভূতি বশিত্ব শক্তির বলে হিংস্র প্রাণীও বশীভূত হয়। এই শক্তি বলেই বামদেব এ করতে পারলেন।

পরদিন সকালে একবার নিজের গাঁয়ের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। গাঁয়ের বাইরেই আশু মণ্ডলের ছেলে হরি মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হ'তে তার সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন বামদেব। তাঁকে এমন করতে দেখে হরি জিজ্ঞাসা করলে কি, কি হলো, খুড়ো?

বামদেব শান্ত কণ্ঠে বললেন, কাল রাত্রে আমাদের শ্মশানের কাছে একটা বাঘ এসেছিল, আমি চিমটে দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলে, সে ডাবুকের দিকে চলে গেল। আজ এইমাত্র সেখানে একটা লোককে ধরলো? লোকটা শৌচ কর্মের জন্য নদীর ধারে এসেছিল। এই বলেই সেখানে আর না দাঁড়িয়ে তারাপীঠের দিকে চলে গেলেন।

পরে খবর নিয়ে জানা গেল—সত্যিসত্যিই ঐ সময় ডাবুকের একটা লোককে বাঘ খেয়েছে।

সিদ্ধ মহাযোগীরাই কেবল বিভূতি বলে একই সময় এক জায়গায় থেকে বিশ্বের যে কোন স্থানে কি ঘটছে তা দেখতে পান।

* * *

অনেকের মনের কথা ফাঁস করে দিয়ে ক্ষেপাবাবা তাদের চৈতন্য এনে দিতেন। একবার এক জমিদার তারাপীঠে পূজো দিতে এসেছেন। মস্ত সমারোহের ব্যাপার। খুব ভোরে দ্বারকা নদীতে

স্নান করে তীরে দাঁড়িয়ে তিনি জপতপ করছেন। ক্ষেপা ঠিক এই সময়ে জলে নামছিলেন, জপনিরত ভদ্রলোকটির দিকে নজর পড়তেই তিনি আর হাসি চাপতে পারলেন না, ছোট্ট ছেলের মত দুষ্টুমি করে তাঁর গায়ে বার বার জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন।

ভদ্রলোক ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, কোত্থেকে এ অসভ্য পাগল এল রে বাবা, জপ করছি, দিলে আমায় অপবিত্র করে।

ক্ষেপা অমনি বলে উঠলেন, এসেছ তারামায়ের কাছে আশ্রয় নিতে, তাঁর নাম জপতে, এর ভেতর আবার স্ম্যর কোম্পানীর জুতোর কথা ভাবা কেন, বাবা?

শুনে চমকে উঠলেন ভদ্রলোক: সত্যিই ত তাই! কলকাতায় গিয়ে এবার ঐ কোম্পানীর একজোড়া দামী জুতো কেনার কথাই তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল। কে এই অন্তর্যামী পুরুষ, মনের সামান্যতম চিন্তাও তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁক দিতে পারেনি।

মন্দিরে ফিরে পাণ্ডাদের কাছে এ ব্যাপার জানালে তারা সমঝিয়ে দিল, ইনি সাধারণ পাগল ন'ন, মশাই, ইনি হচ্ছেন তারাপীঠের সিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপা।

ভদ্রলোকটি ব্যাকুল হয়ে আবার এই মহাপুরুষের দর্শন লাভের চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেদিন তাঁর আর দেখা পাওয়া গেল না, ক্ষুণ্ণ মনে তিনি কলকাতায় ফিরে গেলেন।

* * *

ক্ষেপাবাবা যে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ এ কথা সকলেরই জানা। একবার তাঁর মুখের কথাটি আদায় করতে পারলে মৃতকল্প যোগী সম্বন্ধেও লোকের কোন ভাবনা থাকত না।

সেবার তারাপীঠের নগেনপাণ্ডা বাবাকে খুব ধরে বসলেন তাঁর পরিচিত এক রোগীকে নিরাময় করতেই হবে। রোগীটি হচ্ছেন স্থানীয় এক জমিদার, নাম পূর্ণচন্দ্র সরকার। ক্ষেপাকে পাল্কী করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল।

পথে যেতে যেতে নগেন পাণ্ডা তাঁকে বলতে লাগলেন, বাবা,

আপনি রোগীর কাছে গিয়ে শুধু বলবেন, এই শালা, উঠে বোস, তোর রোগ সেরে গেছে। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না।

সরল বালকের মত মহাপুরুষ বললেন, আচ্ছা, নগেনকাকা, তাই বলবো। মাঝে মাঝে কথাগুলি তুমি আমায় শিখিয়ে দিও, নইলে ভুলে যাব।

রোগীর কাছে গিয়ে তাঁকে যা বলতে শোনা গেল, সে একেবারে এর বিপরীত। তিনি বলে উঠলেন, ও নগেনকাকা, এ শালা ত এখনই ফট্,—অর্থাৎ আর কোন আশা নেই, এখনই জীবনান্ত ঘটবে।

কথা কয়টি বলেই ক্ষেপা পাল্কীতে এসে বসলেন, আর রোগীও প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

নগেন পাণ্ডা বড় হতাশ হলেন। রোগীর আত্মীয়স্বজন তাঁর অনুগত লোক, তাঁকে বড্ড ধরেছিল। ফেরার পথে নগেন পাণ্ডা ক্ষেপাকে বলতে লাগলেন, ছি, ছি, বাবা, এখানে আমার মানমর্যাদা আর কিছু রাখলেন না আপনি। এমন জানলে আপনাকে আর আমি আনতাম না।

বাবা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, রাগ করো না, নগেন-কাকা, সাতাই আমার কোন দোষ নেই। আমি ত তোমার শেখানো মত কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা-মা যে এসে আমার কানে কানে বললে, ক্ষেপা, ও কথা তুই মোটেই বলিস নে, বলে দে—ফট্। আমিও তাই বলে ফেললাম।

* * *

বামদেব যে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন তার অনেক প্রমাণই তৎকালীন লোক পেয়েছে। আর একটা বিবৃত করা যাচ্ছে এখানে—

সেবার রামপুর হাট থেকে এক তরুণী তার বাপের সঙ্গে তারাপীঠ এবং ক্ষেপাবাবার দর্শনে এসেছে, সঙ্গে এনেছে শুদ্ধমনে শুদ্ধভাবে তৈরী করে কিছু ক্ষীরের খাবার।

ভক্তিভরে প্রণাম করে ক্ষেপাকে খাদ্যটা নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা খুশী হয়ে বলে উঠলেন, বেশ, মা, বেশ, তোর ধনেপুত্রে

লক্ষ্মীলাভ হ'ক।

বাবার কথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে আরম্ভ করল। চোখের জল আর থামতে চায় না। বামদেব বিব্রত হয়ে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, ও কাঁদে কেন ?

বাবা, আপনি ত ওকে ঢালাও আশীর্বাদ করে বসলেন, কিন্তু এ হবে কি করে, ও যে বিধবা, পুত্রলাভের আর আশা করে কি করে ?

ক্ষেপাবাবা তখন মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন, কাঁদিস নে, মা, কাঁদিস নে, যা বলেছি আমি, তা সবই হবে, তারা-মা আমায় বলছেন তোর ছেলে হবে, লক্ষ্মীও ঘরে থাকবেন।

ক্ষেপাবাবার এ কথা ফলতে বেশি দেরী হয়নি। কিছুদিন পর এক ধনী বণিক বৈষ্ণবমতে এই তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন। সন্তান সন্ততি এবং ধনসম্পদ সবই লাভ হয়েছিল মেয়েটির।

* * *

বাবা শিমূলতলায় চুপ করে শুয়ে আছেন এমন সময় কয়েকজন লোক একটা খাটিয়া কাঁধে করে তাঁর কাছে এসে হাজির হ'ল। খাটিয়া নামানো হ'লে দেখা গেল তার ওপর এক যক্ষারোগী শুয়ে মৃতকল্প হয়ে ধুঁকছে।

দেখেই ক্ষেপাবাবা বলে উঠলেন, কিরে একে আবার তোরা শ্মশানে নিয়ে এলি কেন, জ্যান্ত পোড়াবি নাকি ? তা শালা পাপ করেছে অনেক, জ্যান্তই ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ওকে পোড়া।

রোগীর এক আত্মীয় তখন ক্ষেপাবাবার কাছে এগিয়ে এসে কাতর-স্বরে বললে, একি বলছেন, বাবা, ওকে যে আপনার চরণতলে ফেলে রাখবার জন্যই নিয়ে এলাম আমরা। ডাক্তার কবরেজ অনেক দেখানো হয়েছে, কিছুতেই কোন ফল হ'ল না। মায়ের একমাত্র সন্তান। আপনি দয়া করে ওকে বাঁচান, বাবা।

দূর হ' বেদো শালারা, আমি কি ডাক্তার, না কবরেজ যে আমার কাছে এনেছিস ?

ভক্তেরা কিছুতেই ছাড়ে না, তাঁর চরণ ধরে নানা অনুনয় বিনয়

করতে লাগল। উত্যক্ত হয়ে ক্ষ্যাপাবাবা তাঁর আসন থেকে উঠে পড়লেন, তারপর হঠাৎ রোগীর উপর ঝুঁকে পড়ে দুই হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, বল, শালা, আর কখনো পাপ করবি?

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রোগীর ত তখন প্রাণ যায় যায়। আত্মীয়স্বজনেরা সব ছুটে এল রোগীর কাছে, ক্ষেপাবাবা কি শেষে খুনের দায়ে পড়বেন? রোগী এর মাঝেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। সেই মূর্ছিত অবস্থায়ই তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বাবা বলে উঠলেন, যা শালা এবার বেঁচে গেলি।

একটু পরেই লোকটির মূর্ছা ভেঙ্গে গেল। সে উঠে বসে বলে উঠল, ভীষণ খিদে পেয়েছে, এখনই কিছু খেতে না পেলে সে বাঁচবে না। এতদিন শরীর তার এত দুর্বল ছিল যে সে বিছানায় পাশ ফিরতে পারত না, আজ তাকে এভাবে নিজে নিজেই উঠে বসতে দেখে সবাই অবাক্।

ক্ষেপাবাবা বললেন, ও শালাকে পেট ভরে ঠেসে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দে। কিছুদিনের জন্য ত এখানে থাক, তারামায়ের দয়ায় ও একেবারে ভাল হয়ে যাবে।

তাকে তাই করা হ'ল। লোকটি এরপর সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়।

* * *

নন্দ হাড়ি বাবার বড় অনুগত ভক্ত। দুই হাতে তার জঘন্য কুষ্ঠ। তাই নিয়েই সে ক্ষেপাবাবার সেবা করে। তাঁর পানীয় জল আনা থেকে সুরু করে বাবার প্রিয় কেলো ভুলো ইত্যাদি কুকুর-গোষ্ঠীর দেখা শুনা করে।

এইসব দেখে একদিন এক ভক্ত তাঁকে বলে বসল, বাবা, নন্দ জাতে হাড়ি, দু হাতে কুষ্ঠ, আপনি ওর হাতের জল খান কেন?

বাবা অমনি বলে উঠলেন, আমিওর হাতের জল খাই, আমার ইচ্ছে, তাতে তো শালাদের কি?

নন্দর উপর এত স্নেহ থাকা সত্ত্বেও বাবা ওর এ রোগটি সারিয়ে

দিচ্ছেন না, নন্দও এ সম্বন্ধে বাবাকে কোনদিন কিছু বলে না।

একবার নন্দর ব্যাধির আক্রমণটা বড় বেড়ে উঠল, পাঁচ সাতদিন সে তারাপীঠের শ্মশানে আসে না। ক্ষেপাবাবা তার জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এই সময় কয়েকজন ভক্ত এসে ধরে বসল, বাবা, নন্দ আপনার এত ভক্ত, অথচ রোগে বড় কষ্ট পাচ্ছে সে, ওকে রোগমুক্ত আপনাকে করতেই হ'বে।

আচ্ছা, নিয়ে আয় ওকে।

নন্দকে সামনে পাওয়া মাত্র বাবা একেবারে তেরিয়া হয়ে উঠলেন: শালা, পাপ করবার সময় মনে থাকে না? যা, দূর হয়ে যা এখান থেকে। তোর ঐ হাত পচে গলে খসে পড়বে।

বাবার এ কঠোর উক্তি শুনে সবার মন খারাপ হয়ে গেল। নন্দ এমনি তিরস্কৃত হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করল।

কিন্তু আর একটু পরেই দেখা গেল বাবার আর এক মূর্তি: নন্দকে কাছে ডেকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে সস্নেহে বলতে লাগলেন, বাবা, এখন থেকে আর পাপ পথে যাবি নে। তারামায়ের নাম করবি। আর ঐ শ্মশানের মাটি দু'হাতে মাখবি। তোর রোগ সেরে যাবে।

বাবার এই কথামত চলে মাসখানেকের মাঝেই নন্দ সম্পূর্ণ নিরাময় হ'ল।

কমলাকান্ত

শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা তন্ত্রসাধক কমলাকান্ত। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র তাঁর গুণগ্রামে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন,

শুধু তাই নয় গুরুদেবকে নিকটে পাবেন বলে বর্ধমান শহরের কাছেই কোটাল হাটে শ্যামাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে চান্না থেকে কমলাকান্তকে সেখানে নিয়ে এসেছিলেন। তেজচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ প্রতাপচাঁদও এই সিদ্ধ সাধকের অসাধারণ গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। গুরুর সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁর মন ছটফট করত, পরপর তিনটি দিনও তিনি কাটাতে পারতেন না বর্ধমানের রাজবাড়িতে. রাজসম্পদ ও আমার তুচ্ছ করে ছুটে আসতেন কোটাল হাটে গুরুর আশ্রমে।

একদিন প্রতাপচাঁদ বর্ধমান থেকে যখন কোটাল হাটে গুরুর আশ্রমে এসে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এ কি,—গুরু এখনও যে তাঁর ঘরে শুয়ে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দেবীর সন্ধ্যারতির সময় বয়ে যায়, মন্দিরের লোকেরা সব দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে। কোন সাড়া নেই। একজন বললে, ঠাকুরের বোধহয় ধ্যান-সমাধি হয়েছে। আর একজন বললে, সমাধি হ'লে বসে থাকতেন, অমনি করে শুয়ে থাকবেন কেন ?

ভাল করে বুঝে নেবার জন্যে কেউ ঘরের ভিতরে ঢুকতে সাহস করছে না। প্রতাপচাঁদ সাহস করে ঢুকে কমলাকান্তের পাশে বসে তাঁর বুকে এবং নাকের কাছে হাত দিয়ে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করলেন। না, জীবনের ক্ষীণতম আভাসও খুঁজে পাওয়া যায় না। গুরুদেব মারা গেছেন মনে করে প্রতাপচাঁদ আকুল হয়ে শিশুর মত কান্না সুরু করলেন: আমরা কি অপরাধ করেছি, বাবা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে।

ব্যাপার বুঝে তখন উপস্থিত সকলের চোখেই জল এসে গেল। সবাই যখন এমন ক্রন্দনরত তখন হঠাৎ এক সময় উঠে বসলেন কমলাকান্ত, যেন মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এলেন পুনর্জন্ম লাভ করে। চোখ মেলে উপস্থিত সকলের চোখে জল দেখে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, কাঁদছিস কেন তোরা, কি হয়েছে ?

উত্তর দিলেন প্রতাপচাঁদ,—সে কি, বাবা, কাঁদব না, দুই ঘণ্টা

ধরে আপনার দেহে প্রাণ ছিল না, নিঃশ্বাস বন্ধ, হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ।

মৃদু হেসে বললেন কমলাকান্ত, আমি একবার চান্না গিয়েছিলাম। তোদের বলা হয় নি, তোরা হৈ-চৈ করবি বলে বলিনি। ভাবলাম ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি। চান্নার সেই শিমূল গাছের তলায় বসে মায়ের নাম করতে করতেই দেরী হয়ে গেল। মা বিশালাক্ষীর সঙ্গে সম্পর্ক ত আমার আজকের নয়, ঐখানেই ত আমার সাধনার হাতেখড়ি। তাই মাঝে মাঝে না গিয়ে পারি না, বেশিদিন না গেলে মায়ের মুখ ভার হয়ে যায়। বয়স হয়েছে, অতদূর যাওয়ার ধকল আর দেহটা সহ্য করতে পারে না, তাই দেহটা ছেড়েই মাঝে মাঝে যাই। যত গোল ত এই দেহটাকে নিয়েই। দেহের খোলসটা ছেড়ে আত্মা আমার এক নিমেষে সেখানে গিয়ে হাজির হয়, কাজ সেরে কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে আসে। অন্যদিন এত দেরী হয় না বলে তোরা বুঝতে পারিস না।

শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সবাই চেয়ে রইল মহাসাধকের মুখের দিকে।

*　　*　　*

তান্ত্রিক প্রথায় শোধিত কারণবারি পান করতেন কমলাকান্ত। প্রতাপচাঁদ কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার পর তন্ত্রমতে এটা দূষণীয় নয় বলে তিনিও মাঝে মাঝে একটু করে প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করতেন। ব্যাপারটা তেজচন্দ্রের কানে যেতে তিনি নিতান্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে ছুটে এলেন কমলাকান্তের কোটালহাটের আশ্রমে। পুত্র প্রতাপচাঁদ আগেই এসেছেন সেখানে। তেজচন্দ্র সরেজমিনে দেখতে চান পুত্র কি অবস্থায় আছে।

তেজচন্দ্র মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তিনি একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়লেন। দেখলেন মন্দিরের বিগ্রহের সামনে বসে কমলাকান্ত একমনে শ্যামাসঙ্গীত গাইছেন, আর পাশেই এক মাটির হাঁড়িতে মদ রয়েছে—তা থেকে মাঝে মাঝে এক পাত্র

করে পান করছেন। প্রতাপচাঁদ একটু দূরে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন গুরুদেবের দিকে।

কমলাকান্ত গুরু হ'লেও তাঁর উদ্দেশ্যে রূঢ় বাক্য নির্গত হ'ল তেজচন্দ্রের কণ্ঠ থেকে : মাফ করবেন, আপনার হীন কাজের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি, আমার পুত্রের অধঃপতনের কারণ এখন আমি বুঝতে পারছি। প্রতাপ, ওঠো চলো বাড়ি চলো।

শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন কমলাকান্ত : রসনা সংযত করে কথা বলো, তেজচন্দ্র, তোমার লৌকিক বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধ সাধকদের ক্রিয়াকলাপের বিচার করতে এস না।

এরপর পানীয়ের হাঁড়িটি তেজচন্দ্রের সামনে ধরে বললেন, একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ ত এতে কি আছে। তুমি যাকে সুরা মনে করেছ সে সত্যিই সুরা না অন্য কিছু। ভাল করে পরখ কর, চোখ দিয়ে দেখ, হাত দিয়ে স্পর্শ কর নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ নাও। তারপর বলবে।

দেখে স্তম্ভিত হ'লেন তেজচন্দ্র। হাঁড়িতে মদ কোথায়, রয়েছে খাঁটি দুধ। পরে সেই দুধ থেকে মাখন তুলে ঘি তৈরী করে দেবীর হোম করে তাতে আহুতি দিলেন কমলাকান্ত।

তেজচন্দ্র বিস্ময়ে হতবাক্। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হাঁড়িতে মদ ছিল নিশ্চয়, কিন্তু গুরুদেব কি করে এক নিমেষে তা দুধে পরিণত করলেন, তা থেকে মাখন ঘিও পাওয়া গেল।

বিহ্বল তেজচন্দ্রের কাছে তখন প্রতাপচাঁদ সেদিনকার সেই ঘটনাটা বললেন। নিজের দেহটা এখানে রেখে কি করে গুরুদেব সেদিন চান্নায় গিয়েছিলেন। শুনে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়ল তেজচন্দ্রের।

প্রতাপচাঁদের এই কথা বলা শুনে কমলাকান্ত শান্তকণ্ঠে বললেন, এ তো সামান্য কথা, সিদ্ধ সাধকেরা ব্যাপ্তিরূপ যোগবিভূতি বলে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সশরীরে অবস্থান করতে পারেন, আমি ত শুধু কায়াটা এক জায়গায় রেখে অশরীরী হয়ে অন্য জায়গায় যাই।

*　　　　*　　　　*

সিদ্ধ কালী-সাধক হিসাবে কমলাকান্তের খ্যাতি শুধু কাছেপিঠে নয় সুদূর কাশীতে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। কাশীর বাঙালী সমাজ একবার ঘটা করে কালীপূজা করবে বলে কমলাকান্তকে নিতে এল। কমলাকান্ত অবশ্য নিজের আসন ছেড়ে কোথাও যান না, কিন্তু কাশী থেকে লোক এসে পীড়াপীড়ি করছে দেখে শেষে রাজী হ'লেন যেতে : এক কাজে তুই কাজ করা হবে বিশ্বনাথ দর্শন করে আসা যাবে।

বাঙালীদের আমন্ত্রণে কাশী এসে কালীপূজায় বসলে—দেখা গেল পূজার বিধিমত আচার অনুষ্ঠানগুলি তিনি আদৌ মেনে চলছেন না, কেবল সুরাপান করছেন। তাঁর মত সিদ্ধ সাধকের অবশ্য পূজার নিয়মকানুন মেনে চলা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। যারা তাঁকে জানে তারা এতে কিছু মনে করে না, কিন্তু যারা জানে না তারা তাঁকে এভাবে দেখলে ক্ষুব্ধ, বিস্মিত হবে বই কি।

প্রতিমার সামনে বসে কমলাকান্ত যখন সুরা পান করতে লাগলেন তখন দর্শকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, এ কি, এ কি পূজা হচ্ছে না কি ?

একজন বললে, উনি সিদ্ধপুরুষ, ওঁর কথা আলাদা।

উনি যদি সিদ্ধ হ'ন ত দেবীকে জাগ্রত করে দেখান না, দেখি।

সুরাপানে কখনো কোন মাদকতা আসে না কমলাকান্তের। স্বাভাবিক জ্ঞান পূর্ণমাত্রায়ই থাকে। ক্ষুব্ধ বাঙালীদের তাঁকে নিয়ে এই বাদ-প্রতিবাদ অনেকক্ষণ ধরে কানে আসছিল তাঁর, শেষে আর সহ্য করতে না পেরে উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, কে মাকে জাগ্রত দেখতে চাও এগিয়ে এস, মা যার অন্তরে সর্বদা জেগে রয়েছেন সে যে কোন বস্তুর মাঝে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। দেখ, তাকিয়ে দেখ। এই বলে বলির খড়্গটা নিয়ে প্রতিমার একটি হাতে আস্তে একটু আঘাত করতেই সেখান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

দেখে বিস্মিত ভীত দর্শকবৃন্দ মা, মা, বলে ডাকতে ডাকতে

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কারোই আর কোন সন্দেহ রইল না—যে কমলাকান্ত একজন সিদ্ধ কালীসাধক।

তিব্বতীবাবা

সমাধিলাভ বা আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হবার পথে অনেক সময় সাধক নিজের অজ্ঞাতেই বিভূতির, অলৌকিক শক্তির অধিকারী হ'ন। নিজের ঐশী শক্তির প্রথম পরিচয়ে নিজেরই বিস্ময় জাগে মনে।

তিব্বতীবাবার পূর্বনাম নবীনচন্দ্র। আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন বলে মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। মানস সরোবরের নিকটবর্তী একটি গুহায় পাতঞ্জলের যোগ পদ্ধতিতে দীর্ঘকাল সাধনা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এরপর লোকহিতায় তিনি তাঁর গুহাটি ত্যাগ করে সমতলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বহু উপত্যকা ও মালভূমি অতিক্রম করে গাঢ়োয়ালে প্রবেশ করলেন। তখনও তিনি মৌনী। তা ছাড়া অযাচক-বৃত্তি অবলম্বন করে পথ চলেছেন তিনি। চলতে চলতে একদিন সন্ধ্যায় পথে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিতে হ'ল তাঁর। বেশি লোক ছিল না সরাইখানায়, মাত্র দুটি লোক একধারে বসে গল্প করছিল। লোকদুটিকে দেখে তেমন ভাল বলে মনে হ'ল না বাবার। বাবাকে দেখেই তারা কৌতুকচ্ছলে নানা অবজ্ঞাসূচক কথা বলতে লাগল: তুমি কোত্থেকে উদয় হ'লে সাধুবাবা? তুমি সাধু না পাগল?—না পাগলের ছদ্মবেশে কোন চোর?

মৌনী নবীনচন্দ্র এ সব কথার কোন উত্তর না দিয়ে নির্বিকার ভাবে সরাইখানার এক কোণে বসে রইলেন। তাঁর এই ঔদাসীন্যে লোকদুটি চটে গেল। তাদের একজন প্রথমে বাবার গায়ে থুথু

দিল। তার দেখাদেখি আর একজনও তাই করলে। নবীনচন্দ্র তখনও নির্বিকার, মুখে কোন কথা নেই, ঘৃণা বা ক্রোধের কোন অভিব্যক্তি নেই।

কিন্তু এ তো হ'ল বাইরের দিক, একটু পরেই টের পেলেন নবীনচন্দ্র তাঁর অভ্যন্তরে কি যেন এক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে: চিত্তাকাশে মেঘ জমতে সুরু করেছে, নিঃশ্বাসে উষ্ণ ঝড় বইছে, চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এক কাতর আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলেন বাবা। তাকিয়ে দেখেন লোক দুটি মেঝের উপর কি এক তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কি হ'ল তাদের মুখে বলতে পারছে না, মুখ দিয়ে শুধু লালা বেরুচ্ছে।

*   *   *

এর তিন দিন পরে আর একটা ঘটনা ঘটল, সেটা আরও মারাত্মক। নবীনচন্দ্র এবার বেশ ভাল করে বুঝলেন তাঁর সুদীর্ঘ তপস্যার ফলে তাঁর মাঝে এমন একটা শক্তির আবির্ভাব হয়েছে, যাকে ঐশী ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। যে অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি লোকের কৃতকর্মের ফল প্রদান করে এ তাই।

ঘটল এটাও এক সরাইখানায়। দিনশেষে ক্লান্ত নবীনচন্দ্র আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে। সেখানে গিয়েই দেখেন বাইশজন যাত্রীর একটি দল তাঁর আগে এসে ওখানে হৈ হুল্লোড় করছে। নবাগত নবীনচন্দ্রের বেশভূষা দেখে নানাভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে সুরু করলে তারা। মৌনী নবীনচন্দ্র নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করতে লাগলেন সবকিছু, তাদের কোন কথার উত্তর দিলেন না। এতে তাদের জিদ যেন আরও বেড়ে গেল। বসবার জন্য নবীনচন্দ্র যে জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন সেখানে কয়েকজন থুথু ফেলে বললে, সাধুবাবার বসবার আসন তৈরী করে দিলাম আমরা। নবীনচন্দ্র নির্বিকার চিত্তে সেখানেই বসে পড়লেন। এতে কোন কাজ হ'ল না দেখে দলের একটি লোক বলে উঠল, সাধুবাবার গলায় দেবার জন্যে একটা মালা তৈরী করে নিয়ে আয়। সঙ্গে সঙ্গে দলের আর

একটি লোক একটা বড় দড়িতে কতকগুলি চামড়ার চটি বেঁধে মালার মত করে পরিয়ে দিল নবীনচন্দ্রের গলায়।

এদের কৃতকর্মের পরিণামের কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেলেন নবীনচন্দ্র: আজও যদি তাঁর নির্মল চিত্তাকাশে মেঘ জমে ওঠে, নিঃশ্বাসে যদি তপ্ত ঝটিকা বয়, দৃষ্টি থেকে অগ্নিবর্ষণ হয়, তা হ'লে আর রক্ষা নেই। অনর্থ এড়াতে মনটাকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন করলেন নবীনচন্দ্র। বাহ্যজ্ঞান বলে আর কিছু রইল না।

মধ্যরাত্রে ধ্যান ভাঙার পর যখন তাঁর চৈতন্য ফিরে এল তখন ঐ লোকগুলির দিকে চেয়ে দেখেন তারা সবাই যেন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। নবীনচন্দ্র ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে গিয়ে তাদের নাকে বুকে হাত দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন—তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

ভীষণ অনুতাপ জাগল নবীনচন্দ্রের মনে: এ কি সিদ্ধিলাভ হ'ল তাঁর, তাঁরই প্রতি অসদাচরণ করে দু'দিনে চব্বিশটি লোক অকাল মৃত্যুর কবলে পড়ল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে নির্জন নদীতীরে বসে চিন্তা করতে লাগলেন: তিনি কি এদের মৃত্যু চেয়েছেন? চান নি ত। তবে? গভীরভাবে চিন্তা করে শেষে বুঝলেন বাইরে প্রকাশ না করলেও মনে মনে রুষ্ট হয়েছেন তিনি ওদের প্রতি, তারই ফল এ। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল লোকালয়ে যখন তিনি এসে পড়েছেন তখন তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করা উচিত, ঐ লোকগুলির সঙ্গে কথা বললে হয়ত ওদের কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করা যেত, এমন মর্মান্তিক পরিণতি হ'ত না।

* * *

যোগসিদ্ধির ফলে নবীনচন্দ্র যে সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তার প্রমাণ পেতে আদৌ বিলম্ব হ'ল না। পরদিন সকালেই এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে প্রাণ কেঁদে উঠল

নবীনচন্দ্রের। দেখলেন এক মুসলমান জমিদারের দশ এগারো বছরের একমাত্র পুত্রকে কবর দিতে এসেছে লোকজন। ছেলেটির বাপের ত কথাই নেই, শোকে সঙ্গের লোকজনও মুহ্যমান। কবর দেওয়া শেষ করে আল্লার নাম স্মরণ করে সবাই সেখান থেকে চলে গেল। চব্বিশটি লোকের মৃত্যুর কারণ তিনি এ কথা ভুলতে পারেন নি নবীনচন্দ্র, যদিও নিজের ইচ্ছায় তিনি তাদের মৃত্যু ঘটান নি, তাঁর বেদনার্ত হৃদয়ের তপ্ত নিঃশ্বাসে ঐশ্বরিক কোন অবোধ্য বিধানেই এটা ঘটে গেছে। তবু মনের ক্ষোভ তাঁর যায় না। এবার তাঁর মনে হ'ল লোকের গর্হিত আচরণে তাঁর চিত্তে রোষবাষ্প জমলেই যদি তাদের প্রাণহানি ঘটে তা হ'লে এত দিনের সাধনায় একটা কিশোর প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করবার ক্ষমতাও তাঁর হয়েছে। যদি না হয়ে থাকে তা হ'লে এতদিনের যোগসাধনা তাঁর বৃথা।

এমনি সব চিন্তা নিয়ে ঢুকে পড়লেন নবীনচন্দ্র গোরস্থানে। লোকজন কেউ আর তখন সেখানে নেই। তিনি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে কবরের কাঁচা মাটি সরিয়ে বের করলেন বালকের মৃতদেহটি। যোগসিদ্ধ নবীনচন্দ্র হয়ত কেবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে, শুধু স্পর্শের দ্বারাই বালকটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে মৃতের পাশে বসে তার প্রাণদানের ইচ্ছা নিয়ে প্রাণায়ম করতে লাগলেন। প্রাণায়ম করেন আর তার রেচক বায়ু বাইরে ত্যাগ না করে মৃত বালকটির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করান। তিনবার এই রকম করার পরই ছেলেটি চোখ মেলে চাইল। দেখে নবীনচন্দ্রের মনে আনন্দের সীমা রইল না: এই ত তাঁর পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা লাভ হয়েছে।

ঘুম ভাঙার মত চোখ করে ছেলেটি তখন চেয়ে রইল নবীনচন্দ্রের দিকে। নবীনচন্দ্র তখন তার পিঠে একটা আদরের চাপড় দিয়ে বললেন, চেয়ে দেখছিস কি, যা এবার বাড়ি যা। তোকে দেখে বাড়ির লোকের কত আনন্দ হবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবি এক সন্ন্যাসী আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

তুমিও চলো না, সাধুবাবা আমাদের বাড়িতে, বাবা দেখলে কত খুশী হবেন।

না রে, আমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছি, আমার আর কোন ঘরে যেতে নেই,—বললেন তিব্বতীবাবা।

* * *

আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যকার পার্বত্য অঞ্চলে কত বিরাট গহন অরণ্য। সেই অরণ্য পথে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে চলেছেন নবীনচন্দ্র। তিনি যে সাধনার অতি উচ্চস্তরে পৌঁচেছেন তা বুঝেছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা, কিন্তু বৌদ্ধলামার প্রদর্শিত পথে সাধনা করেও যে তিনি হিন্দু বৈদান্তিক এ কথা তাঁর মুখে শুনে তাঁদের ক্ষোভ রয়ে গেছে মনে, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বেশ কিছুটা বিরূপ মনোভাবও রয়ে গেছে।

বিপদসঙ্কুল অরণ্যপথে যেতে নবীনচন্দ্রের একটি আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে বারবার বিস্মিত হয়েছেন তাঁরা ঃ যে সব হিংস্র জন্তুর কাছে যেতে ভয় পান তাঁরা, নবীনচন্দ্র তাদের মাঝখান দিয়ে নির্ভয়ে অবলীলাক্রমে চলে যান।

একদিন এই ধরনের এক অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁরা একেবারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁদের বহুগুণ বেড়ে গেল। পথে এক জায়গায় বসে আপন মনে জপ করছিলেন নবীনচন্দ্র। পাশেই সন্ন্যাসীরা। হঠাৎ বাঘের গায়ের তীব্র বিকট গন্ধ নাকে যেতে ভয় পেয়ে গেলেন সন্ন্যাসীরা। দেখতে না দেখতে মস্ত বড় একটা বাঘ গর্জনে তাঁদের পিলে চমকে দিয়ে তাঁদের দিকেই এসে পড়ল। সন্ন্যাসীরা তখন প্রাণভয়ে বাঘ, বাঘ বলে চীৎকার করে নবীনচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলেন। নবীনচন্দ্র হিংস্র জন্তু দেখে ভয় পান না দেখে তাঁদের হয়ত মনে হয়েছিল,—ইচ্ছা করলে ইনিই তাঁদের রক্ষা করতে পারেন।

সন্ন্যাসীরা এমন জড়িয়ে ধরায় এবং তাঁদের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে চোখ মেললেন নবীনচন্দ্র, মেলে দেখলেন সত্যিই একটা বড় বাঘ

ধীর অথচ দৃপ্ত পদক্ষেপে—এই বুঝি তাঁদের উপর ঝাঁপ দেয়। নবীন চন্দ্র অমনি সন্ন্যাসীদের পিছনে ঠেলে দিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন বাঘটির দিকে। বাঘটি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কি দেখলে সেই জানে, পরক্ষণে সমস্ত হিংসা, রক্তপিপাসা বিসর্জন দিয়ে পোষা বেড়ালের মত আবদারের ভঙ্গীতে তাঁর পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়তে লাগল। তিব্বতীবাবা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন, এঁরা ত তোমার কোন অনিষ্ট করেন নি, তবে কেন তুমি হিংসার ভাব নিয়ে এঁদের কাছে ছুটে এসেছ? যাও, তুমি এখান থেকে চলে যাও, আর কোনদিন সাধু সন্ন্যাসীদের জপতপের বিঘ্ন ঘটাতে এস না।

বাবার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটি নীরবে সেখান থেকে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নবীনচন্দ্রের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ত হলেনই তা ছাড়া লজ্জিত হ'লেন—নিজেদের জন্যে; এতদিন বৃথাই তাঁরা ভগবান তথাগতের অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে এসেছেন, হিন্দু হ'লেও অহিংসায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের এই সঙ্গী সন্ন্যাসীটি।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে সারা ভারতে। তিব্বতীবাবা তখন আসামে। পার্থিব সুখদুঃখে অবিচলিত থাকাই যদিও তাঁর ধর্ম তবু দেশব্যাপী নৃশংস নরহত্যার কথা শুনে চিত্ত তাঁর ব্যথাহত হয়ে উঠল। এলেন তিনি বিহারে, বিহার থেকে কানপুরের পথে এগিয়ে চললেন তিনি।

কানপুরের কাছে গিয়ে দেখেন চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। শহরের মধ্যে গিয়ে দেখেন ইংরেজ-সৈন্যরা তাদের সেনাপতির নেতৃত্বে সমর্থ বলিষ্ঠ যুবকদের যেখানেই পাচ্ছে ধরে ধরে মারছে অথবা বন্দী করছে, বাড়ির ভিতর থেকেও যুবকদের নিস্তার নেই।

নবীনচন্দ্র নির্ভয়ে সোজা তাদের সেনাপতির কাছে গিয়ে বললেন,

অথবা এদের নির্যাতন করছ কেন, যারা তোমাদের আঘাত করেছে বা কোন ক্ষতি করেছে তাদের তোমরা শাস্তি দিতে পার, কিন্তু নিরপরাধ যুবকদের কেন ?—এ তো অন্যায়, অবিচার।

সেনাপতি বিদ্রোহ দমন করতে সবে দেশ থেকে এসেছে, নবীনচন্দ্রের ভাষা বুঝতে না পারলেও প্রতিবাদের ভঙ্গী দেখেই রেগে গেল, কিন্তু সৌম্যদর্শন গৈরিকবসন সন্ন্যাসীর দিকে ভাল করে একবার চেয়ে দেখবার পর মনটা তার একটু নরম হ'ল কিন্তু পরক্ষণে তার সরকারী কর্তব্যের কথা স্মরণ করে কঠোর স্বরে কিছু কাঁচা হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে বললে, কে তুমি, কেন শাস্তি দিচ্ছি, তোমার কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি আমার ?

নবীনচন্দ্র তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল তিব্বতে কাটিয়েছেন। তা ছাড়া বৌদ্ধপদ্ধতিতে সাধনাও করেছেন তাই এ কথার উত্তরে বললেন, আমি একজন তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ থেকে আসছি। নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করছ কেন এ কথা শুধু জানতে চেয়েছি আমি। তোমার কাছে, কৈফিয়ৎ চাই নি। কৈফিয়ৎ যদি কিছু দেবার থাকে তা দাও তুমি তোমার আত্মার কাছে।

সেনাপতির কথার উত্তর দিলেন নবীনচন্দ্র নির্ভুল ইংরেজিতে। সেকালে ইংরেজি শিক্ষার তেমন চল ছিল না; সন্ন্যাসীর মুখে বিশুদ্ধ ইংরেজি বাত শুনে সবাই আশ্চর্য হ'ল, সৈন্যদের কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে তাঁর আশে পাশে ভিড় করে দাঁড়াল। সেনাপতি নিজেও আশ্চর্য হয়ে তাঁকে বললে, তুমি তিব্বতের সন্ন্যাসী হয়ে এমন ইংরেজিতে কথা বললে কি করে ?

নবীনচন্দ্র বললেন, যে যে ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলে আমি ঠিক সেই ভাষাতেই তার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

সেনাপতি প্রাচ্যের সাধুদের যোগৈশ্বর্যের কথা জানে না, তবে রীতিমত বিস্মিত হ'ল বই কি, ভাবলে এ সাধুর হয়ত কিছু যাদুবিদ্যা জানা আছে। যাই হ'ক সন্ন্যাসীর কাছে হার মানা তার চলে না,

তার সামরিক ঠাঁট বজায় রাখতে সে বললে, তুমি আমাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছ, তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব।

নবীনচন্দ্র বললেন, আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি তোমাদের বড় কর্তার কাছে, গিয়ে তোমাদের কাজের প্রতিবাদ করব। নিজে আমি বন্দী হ'তে রাজী আছি, কিন্তু অন্যায়ভাবে তোমরা যাদের ধরেছ তাদের ছেড়ে দিতে হবে।

শুনে ভ্রূকুটি জেগে উঠল সেনাপতির চোখে: তোমার কথামত যদি আমি না চলি?

সেনাপতির কথা শুনে একটু হাসলেন নবীনচন্দ্র, একটু ভাবনাও হ'ল—এদের ব্যবহার যদি চিত্তাকাশে আবার মেঘ জমে ওঠে। নিঃশ্বাসে যদি ঝড় বয় তা হ'লে আগেকার সেই চব্বিশজন অশিষ্ট লোকের মত এতগুলি মানুষের প্রাণের উদ্ধত উচ্ছ্বাস বিকৃত স্পর্ধা চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে যাবে। নিজেকে সংবরণ করলেন নবীনচন্দ্র, চেষ্টা করে নিজের মন নির্বিকার রেখে মৃদু হেসে বললেন, আত্মার বিপুল শক্তি জানা নেই তোমার, সেই শক্তি যদি আমার মাঝে জাগে তা হ'লে তোমাদের সব কিছু বানচাল করে দিতে পারি আমি এক মুহূর্তে।

সেনাপতি উদ্ধতকণ্ঠে বলল, আমি তোমার কোন কথা শুনব না, যাদের বন্দী করেছি তাদের সব জেলে নিয়ে যাব, দেখি তুমি কি করতে পার।

এই বলে সেনাপতি তার সৈন্যদের হুকুম দিলেন বন্দী করা যুবকদের সব কানপুর জেলে নিয়ে যেতে।

কিন্তু সৈন্যরা বন্দীদের নিয়ে জেলের দিকে এক পা যেতে না যেতে তাদের বন্দুকগুলি আপনা হতে হাত থেকে খসে পড়ে গেল। হাত সব অবশ। অনেক চেষ্টা করেও তারা তা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে পারলে না। শরীর তাদের এর মাঝেই অসম্ভব দুর্বল আর নিস্তেজ হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে থাকতেও যেন তারা আর পারছে না।

সেনাপতি জোর হুকুম দিচ্ছেন তাদের বন্দুক কুড়িয়ে নিতে, তারা তা কিছুতেই পারছে না।

সেনাপতি তখন নবীনচন্দ্রের দিকে চেয়ে—চীৎকার করে বলে উঠল, তোমার যাদু থামাও, আমার সৈন্যদের ঠিক করে দাও, চালু করে দাও। তোমার কথা মেনে নিচ্ছি আমি, বন্দীদের ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু ওরা আর যাতে বিদ্রোহ না করে তার জন্য দায়ী থাকতে হবে তোমার।

বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে সৈন্যেরা কিছুটা এগুলেই জনতা তিব্বতী বাবার জয়, তিব্বতীবাবার জয়—বলে নবীনচন্দ্রের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। নবীনচন্দ্র সাহেবের কাছে নিজেকে তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন বলে তাঁর নাম রাখল তিব্বতীবাবা।

* * *

বয়স কবে দুশো বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে, দেহটা বড়ই জীর্ণ হয়ে পড়েছে কিন্তু সুযোগ ভক্ত ও শিষ্যদের বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ও যোগসাধন পদ্ধতি শিক্ষা দেবার জন্য আরও কিছুকাল মরদেহে থাকার প্রয়োজন বোধ করছেন তিনি। একদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে এক সুযোগ মিলে গেল তাঁর।

নৈনিতাল থেকে হৃষীকেশ হয়ে নেপালে যাচ্ছিলেন তিনি। দুর্গম পার্বত্য পথে যেতে যেতে দেখলেন একটা গুহার পাশে এক বলিষ্ঠ তিব্বতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মৃতদেহ। সন্ন্যাসী যুবক, সবে মাত্র দেহ ত্যাগ করেছে। এ দেখে হঠাৎ একটা খেয়াল চাপল বাবার মাথায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত বলেইছেন—মৃত্যু হচ্ছে আত্মার নববস্ত্র পরবার জন্য জীর্ণবসন পরিত্যাগের মত, নবদেহ ধারণ করবার জন্য জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করা। এই যদি হয় তা হ'লে আমিও ত আমার বার্ধক্যজীর্ণ দেহটি ছেড়ে এই যুবাসন্ন্যাসীর দেহটি ধারণ করতে পারি।

বড় কঠিন কাজ, সাধারণ সাধকের পক্ষে এ সম্ভব নয়। বহুকাল আগে একমাত্র শংকরাচার্যই কামকলায় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নিজের দেহ ছেড়ে এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করেছিলেন। তিব্বতী বাবা যোগসিদ্ধ পুরুষ, অনায়াসে নিজেকে নিজের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন, তাই তাঁর পক্ষে এ কাজ অসম্ভব নয়। কাছের নদী থেকে স্নান করে এসে ধ্যানে বসলেন তিনি, তারপর যোগবলে নিজের জীর্ণদেহ ত্যাগ করে পাশের মৃত দেহটির মধ্যে প্রবেশ করলেন। নূতন দেহ লাভ করে এক নূতন জৈবশক্তি পেয়ে পরিত্যক্ত পূর্বদেহের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশের দিকে যাত্রা করলেন।

*   *   *

পালিতপুরের জমিদার ভূতনাথ বাবুর সাত আট বৎসরের একমাত্র পুত্র দুরারোগ্য যকৃতের রোগে দু' বৎসর ভুগে মরতে বসেছে। এই দু' বৎসর ধরে কত ডাক্তার কবিরাজ দেখানো হয়েছে, কিছুতেই কিছু হয় নি। ভূতনাথ বাবু তাঁর ছেলেটিকে এনে তিব্বতীবাবার পায়ের কাছে নামিয়ে তাঁর পা ধরে কাতরকণ্ঠে বললেন, বাবা, আমার একমাত্র সন্তান এ, একে আপনি রোগমুক্ত করে বাঁচান, তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে এ, এ আর আমরা চোখে দেখতে পারি না।

ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন তিব্বতীবাবা : রক্ত-শূন্য পীতবর্ণ কঙ্কালসার দেহ, চক্ষু দুটি নিষ্প্রভ।

একে নিয়ে যা আমার সামনে থেকে, আমি পারব না, আমি ডাক্তার না কবরেজ ?—বলে উঠলেন বাবা।

এর মাঝে ভূতনাথ বাবুর স্ত্রীও সেখানে এসে গেলেন, তিনি এসে বাবার দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন : বাবা, দয়া করুন আমাদের, এ না বাঁচলে আমরা দু'জনও বাঁচব না।

এবার যেন বাবার মনটা একটু পালটালো, দু'চোখ বুজে কি ভাবতে লাগলেন তিনি, তারপর চোখ খুলে বললেন, ঠিক আছে—

আজ ঠিক সন্ধ্যেয়—মানে গোধূলি বেলায় অল্প বয়সের একটা সাদা ভেড়া দিয়ে আসবি আমার এখানে। এক ডাকে যা দাম চায় তাই দিয়ে নিবি। সেই ভেড়া আর ছেলেটিকে নিয়ে সারারাত আমি একটা ঘরের মাঝে থাকব। আমি কি করছি না করছি বাইরে থেকে তা যেন কেউ না দেখে।

ভূতনাথবাবু বাবা যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমন করে বাচ্চা সাদা ভেড়া একটা নিয়ে এলেন যথা সময়ে বাবার আশ্রমে। সন্ধ্যা হতেই ভেড়া নিয়ে ঢুকলেন বাবা একটা মাটির ঘরে। ছেলেটিকে আগেই এনে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সে ঘরে। সেদিন দুপুর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, সে বৃষ্টির থামার নাম নেই।

উৎকণ্ঠায় সারারাত দুই চোখের পাতা এক করতে পারেন নি ভূতনাথ বাবু। তাঁর স্ত্রীর চোখেও সে রাত্রে ঘুম ছিল না, ছিল কেবল রাত্রির ঘন অন্ধকার আর অশ্রু। সারারাত দুই জন জেগে কাটালেন। অবশেষে এক সময় ভোর হ'ল, বৃষ্টিও থামল। তিব্বতী বাবা হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, যা, তোদের ছেলেকে 'নিয়ে যা, তার আর কোন রোগ নেই।

ভূতনাথবাবু বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন : আপনি মানুষ ন'ন, দেবতা।

বাবা নিজের পা দুটো সরিয়ে নিয়ে বললেন, তোর ছেলেকে এবার বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঝোল ভাত খেতে দে, বেচারা অনেকদিন কিছু খেতে পারে নি।

ভূতনাথবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর পুত্র অমরনাথ সুস্থ হয়ে শয্যা থেকে উঠে বসেছে, যার মুখে এতদিন কোন কথা ছিল না, সে এখন বেশ স্পষ্ট কণ্ঠে বলছে বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

এদিকে আর একটা দৃশ্য চোখে পড়ায় কিছুটা ব্যথিত না হয়ে পারলেন না ভূতনাথবাবু : সেই ধবধবে সাদা মেষশাবকটির দেহবর্ণ আর সাদা নেই, একেবারে হলদে হয়ে উঠেছে। গায়ের চামড়া

আর হৃষ্টপুষ্ট দেহটাও হয়ে উঠেছে—ক্ষীণকায় শীর্ণ।

তিব্বতীবাবা মেষশাবকটির দিকে চেয়ে বললেন, এ আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। তোর ছেলের রোগ সঞ্চারিত করেছি এর দেহে। এ মারা গেলে একটা নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে একে কবর দিবি।

ভূতনাথবাবু হৃদয়ের আবেগ চেপে রাখতে না পেরে মেষশাবকটির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তোমার আত্মার উর্ধ্বগতি দিন, তোমার পরোপকারী আত্মা পর জন্মে এক মহত্তর জীবন লাভ করুক।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

নারায়ণগঞ্জের বারদী গ্রামে এক সন্ন্যাসী এসেছে, তার হাবভাব দেখে সবাই মনে করে সে পাগল। এই পাগল যে কিসের পাগল, কেমন পাগল তার পরিচয় পেতেও বড় বেশি দেরী হল না।

গ্রামের কয়েকজন, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এক জায়গায় বসে যজ্ঞোপবীত তৈরী করছেন, হঠাৎ সুতোগুলো কেমন জট পাকিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সে জট খোলা যাচ্ছে না কিছুতেই। এমন সময় দেখা গেল নবাগত পাগল সন্ন্যাসীটা এগিয়ে আসছে সেখানে। পাগলটার আচার বিচার নেই, যেখানে সেখানে ঘোরে, কাছে আসতে ব্রাহ্মণেরা

'ভাবলেন ভারী মুস্কিলে পড়া গেল' ত। ও কি জাত, অস্পৃশ্য না অন্ত্যজ তাও তা জানা নেই। ব্রাহ্মণেরা তাকে সতর্ক করে দিলেন—সে যেন কাছে না আসে।

কে কার কথা শোনে। পাগল সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে তাঁদের কাছে এসে বললে, পৈতের প্যাঁচ কি করে খুলতে হয় গো?

কেন, গায়ত্রী জপ করে।

তবে তা করছ না কেন?

ব্রাহ্মণদের তখন মনে হ'ল, তাই ত, কার ভিতর কি বস্তু আছে, উপর দেখে তা কিচ্ছু বলা যায় না। পাগলা সন্ন্যাসীকে তখন তারা বলে বসলেন, বেশ ত, তুমি এত জান ত তুমিই খুলে দাও না দেখি।

পাগল তখন এগিয়ে এসে জট পাকানো পৈতের উপর হাত রেখে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নিল, তারপর একটা করতালি দিয়ে সূতোর দুই প্রান্ত ধরে সজোরে দিল এক টান।

ব্রাহ্মণেরা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখেন সেই টানে পৈতের জটিল গ্রন্থিগুলি সব সরল হয়ে খুলে গেছে।

এই পাগলই হচ্ছেন অলৌকিক শক্তিধর মহাযোগী শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। এই সামান্য ঘটনাই বারদী গ্রামবাসীর চোখ খুলে দিল, তাঁরা বুঝলেন এই পাগল সত্যিকার পাগল নয়, পাগলের ছদ্মবেশে মহাশক্তিধর এক আধ্যাত্মিক সাধক।

* * *

বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ একদিন এক ফৌজদারী মামলার সাক্ষ্য দিতে গিয়েছেন আদালতে। যেতে হয়েছে তাঁকে, কারণ মামলাটি তাঁরই আশ্রম-সংক্রান্ত এক ব্যাপারে: আশ্রমের এক শিষ্যের সঙ্গে স্থানীয় জমিদার বাড়ীর একটি ছেলের মারামারি হয়েছে, আর লোকনাথ তাঁর ঘর থেকে ব্যাপারটি দেখেছেন। তাই তাঁকে সাক্ষী মানা হয়েছে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় লোকনাথকে দাঁড় করানো হ'লেই বিপক্ষের উকিল তাঁকে প্রশ্ন করল, আপনার বয়স কত ?

দেড়শো বছর।

শুনে উকিল রেগে গিয়ে বলল, রসিকতার জায়গা নয় এটা, ঠিক ঠিক উত্তর দিন, সত্যি কথা বলুন।

লোকনাথ শান্তভাবে বললেন, আমি মিথ্যা কথা বলি না, তবে আমার কথা বিশ্বাস না হয়তো তোমার যা খুশি লিখে নিতে পারো।

লোকনাথ দেড়শো বছর বলেছেন বলে বিপক্ষের উকিল যেন এক আইনের ফাঁক পেয়ে গেল, কারণ অত বয়স হ'লে লোকে কখনও নিজের ঘর থেকে বাইরে কোন জিনিস লক্ষ্য করতে পারে না। এবার ব্রহ্মচারীকে ঘায়েল করা যাবে ভেবে উকিল লোকনাথকে বললে, আচ্ছা মেনে নিলাম আপনার কথা, দেড়শো বছরই আপনার বয়স, কিন্তু অত বয়স হ'লে ঘরে থেকে বাইরে কি ঘটছে তা আপনি দেখলেন কি করে ? দেখা ত যায় না।

শুনে হাসলেন লোকনাথ, হেসে বললেন, আমার বয়স না হয় বেশি, তোমাদের ত আমার চেয়ে অনেক কম, ভাল দেখতে পাও, আচ্ছা দূরে ঐ যে গাছটি দেখা যাচ্ছে ওতে কোন প্রাণী আছে কি না দেখতে পাচ্ছ ?

উকিল সেদিকে তাকিয়ে বলল, কই কিছুই ত দেখছি না।

কৌতূহলী হয়ে আদালতে যারা উপস্থিত ছিল সবাই একবার গাছটির দিকে তাকাল। তাকিয়ে ভাল করে দেখে বললে, না, কোন প্রাণী নেই।

শুনে লোকনাথ একটু হাসলেন, হেসে বললেন, আমি ত এখান থেকে স্পষ্ট দেখছি সার বেঁধে অজস্র লাল পিঁপড়ে গাছটার গা বেয়ে উপরে উঠছে। আমি বুড়ো মানুষ হয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছি, আর তোমাদের বয়স কত কম, তবু দেখতে পেলে না ?

ব্যাপারটা সত্যি কি না যাচাই করতে অনেকেই গাছটার কাছে ছুটে গিয়ে দেখে উনি যা বলেছেন সত্যিই তাই।

উকিলটা অবাক ত হ'লই, এরপর লোকনাথের সব কথাই সত্য বলে মেনে নিল।

* * *

ব্রহ্মচারী একদিন নিজের আশ্রমে বসে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় হঠাৎ তিনি কথা থামিয়ে তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে আপন মনে কাকে বলে উঠলেন, আঃ—থামো, থামো।

ভক্তদের কেউই ব্যাপারটা বুঝল না, সাহস করে গুরুকে জিজ্ঞাসা করতেও পারল না।

আসল ব্যাপারটা বুঝা গেল ঘটনার কয়েকদিন পরে। ঢাকার নাম করা উকিল বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী বাবার বিশেষ ভক্ত, দেখা করতে এসেছেন তিনি বাবার সঙ্গে। তাঁকে দেখেই বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বিহারী, তুই এর মাঝে আমার কথা কি খুব মনে করেছিলি?

বিহারীলাল বললেন, আমি আসাম গিয়েছিলাম, সেখান থেকে এসেই আপনার কথা মনে হওয়ায় চরণ দর্শন করতে এলাম।

লোকনাথ বললেন, সে কথা নয়, এর মাঝে জাহাজে চড়ে জলপথে কোথাও যাবার সময় আমাকে মনে প্রাণে স্মরণ করেছিলি?

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন বিহারীলাল, কয়েকদিন আগের ভীষণ বিপদ এবং তা থেকে রহস্যজনকভাবে উদ্ধারের কথা একে একে সব মনে পড়ে গেল তাঁর।

এই ত মাত্র কয়েকদিন আগে মেঘনা নদীর উপর দিয়ে স্টীমারে করে আসাম যাচ্ছিলেন তিনি। পথে হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল, নদীর বুকে পেল্লায় সব ঢেউ, জাহাজ এই ডোবে ত এই ডোবে। প্রাণ ভয়ে বিহারীলাল আকুল হয়ে তাঁর গুরুদেবকে ডাকতে লাগলেন। এই করতে গিয়ে কিছুকালের মত তাঁর বাহ্যজ্ঞানই যেন রইল না।

তারপর হঠাৎ সম্বিদ ফিরে পেয়ে দেখেন সব বিপদই কেটে গেছে। কোন এক অদৃশ্য সত্তার অলৌকিক নির্দেশে ঝড়ের দাপাদাপি নদীর তুফান সবকিছু থেমে গেছে। ব্যাপার কিছু বুঝলেন না বিহারীলাল। পরে অন্যান্য যাত্রীদের মুখে শুনলেন সেই ভীষণ ঝড়ের মাঝে নদীর ঢেউগুলির উপর একটি আশ্চর্য লম্বা হাত তারা দেখতে পেয়েছে, কোথাও কোন মানুষ নেই, শুধু একটি হাত।

বাবার প্রশ্ন শুনে বিহারীলালের এবার বুঝতে বাকী রইল না, সেই আশ্চর্য হাতটি হচ্ছে তাঁরই গুরু পরম করুণাময় লোকনাথ ব্রহ্মচারীর।

* * *

গাঁয়ের জমিদার নাগবাবুদের বাড়ির একটি বউয়ের ছেলে হওয়ার কয়েকদিন পরেই সে হঠাৎ রোগে মারা গেল। ছেলেটিকে নিয়ে মহা ভাবনায় পড়ল বাড়ির সবাই : কে মানুষ করবে একে? ছেলের এক পিসীমা ছিলেন, নাম তার সিন্ধুবাসিনী, তিনি অবশ্য মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করতে রাজী, কিন্তু তাঁর বুকে যে দুধ নেই, থাকবে কি করে, সধবা হ'লেও তিনি যে বন্ধ্যা। কি করবেন বুঝতে না পেরে ছেলেটিকে কোলে করে সোজা লোকনাথ বাবার কাছে হাজির হ'লেন তিনি। তাঁর মুস্কিলের কথা সব খুলে বললেন তিনি বাবাকে।

শুনে করুণা জাগল বাবার মনে। তিনি সিন্ধুবাসিনীকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, কে বললে তুমি বন্ধ্যা? মনে কর আমি তোমার ছেলে, তুমি আমার মা—এই বলে বাবা শিশুর মত সিন্ধুবাসিনীর বুকে মুখ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুক দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই দুধ ঝরতে লাগল। এরপর মা-মরা ছেলেটি সিন্ধুবাসিনীর বুকের দুধ খেয়ে বেঁচে গেল, বড় হয়ে উঠতে লাগল। এই জন্যই ছেলেটির নাম রাখা হ'ল ব্রহ্মপ্রসন্ন।

* * *

আশ্রমের কয়েকজন লোকের উপর কি কারণে ভীষণ রেগে গিয়ে গাঁয়ের দুটি লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আশ্রম আক্রমণ করতে এসেছে। রাত্রি তখন প্রায় একটা। লোক দুটি সবে আশ্রমে ঢুকেছে এমন সময় কোথেকে এক বাঘ ভীষণ গর্জন করতে করতে আশ্রমের উঠানে এসে হাজির হ'ল। লোক দুটি তখন ভয়ে একটা খালি ঘরের মধ্যে ঢুকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল।

আশ্রমের মাঝে বাঘের গর্জন শুনে আশ্রমের লোক সব জেগে গেছে, বাবাকেও জাগিয়েছে তারা। লোকনাথ বাবা বাঘটিকে দেখে ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে বিড়াল আদর করার মত তার গলায় মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, বাবা, এটা আশ্রম, কত লোকজন রয়েছে এখানে, এখানে আসা তোমার ঠিক হয় নি। তুমি এখান থেকে বনে জঙ্গলে যাও, সেখানে গেলেই তোমার শিকার মিলবে।

বাঘটি বাবার কথা শুনে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে পোষা কুকুরের মত কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

লোক দুটি ঘরের মাঝে লুকিয়ে থেকে এই দৃশ্য দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, অনুতাপ জাগল তাদের মনে: যে মহাপুরুষের প্রেমে বনের হিংস্র পশু তার হিংসা ভোলে, তাঁর আশ্রমে হিংসার মনোভাব নিয়ে এসে মহা অন্যায় করেছে তারা। পাপ স্বীকার করে বাবার কাছে ক্ষমা চাইলে বাবা তাদের নিশ্চয় ক্ষমা করবেন এই বিশ্বাসে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে অকপটে মনের পাপ স্বীকার করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে বাবা তাদের ক্ষমা করলেন, বললেন, এমনটি আর করিস না।

*　　*　　*

ডাক্তার নিশিকান্ত বসু বারদী গাঁয়ের নাগবাবুদের আত্মীয়। তিনি আমেরিকায় ডাক্তারি করতেন। তিনি একবার ভারতে ফিরে এসে নাগাবাবুদের বাড়িতে যে অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি নিজের মুখে সকলকে শুনিয়েছিলেন তা এখানে বিবৃত করা হচ্ছে।

একবার এক মার্কিন মহিলা ডাক্তার বসুর কাছে আসেন। বিশেষ এক কঠিন ব্যাধিতে তিনি বহুদিন ধরে ভুগছিলেন। ওখানকার আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার কোন ফল হয় নি তাঁর। ডাক্তার বসুকে ভারতীয় জেনে তিনি তাঁকে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মত চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার বসু তাঁকে জানান তিনি ভারতীয় হলেও ওখানকার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা তাঁর জানা নেই, পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসাতেই তিনি অভ্যস্ত।

ডাক্তার বসু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন মহিলাটি চীৎকার করে বলে উঠলেন, ডাক্তার, তোমার পিছনে কে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার বসু পিছনে ফিরে তাকালেন, কাউকে দেখতে না পেয়ে বললেন, কই, কেউ না ত, আপনার চোখের ভুল।

মহিলাটি জোর গলায় বললেন, চোখের ভুল আমার হতেই পারে না : আমি স্পষ্ট দেখলাম, জটাধারী দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ এক ভারতীয় সাধু আপনার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নিশিকান্ত বাবু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন—কি ব্যাপার। ঠিক তখনই মহিলাটি আগের চেয়েও বেশি জোরে চীৎকার করে বলে উঠলেন, এ কি আমার হাতে এ শুকনো শিকড় দিয়ে গেল কে ?

দেখে নিশিকান্ত বাবুও অবাক : সত্যিই মহিলাটির হাতে এক অজানা গাছের শুকনো জড়ি।

মহিলাটি ডাক্তারের পরামর্শমত সেই জড়ি বেটে খেতেই তাঁর কঠিন রোগে চিরদিনের মত সেরে গেল।

কৌতূহলী নিশিকান্তবাবু মহিলাটির কাছে ঐ ভারতীয় সাধুর সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনে নিয়েছিলেন, বারদী এসে লোকনাথ বাবাকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন, আরে, এ যে দেখছি সেই সাধু মার্কিন মহিলাটি যাঁকে আমার পিছনে দেখে চীৎকার করে উঠেছিলেন। তাঁর বর্ণনার সঙ্গে এঁর চেহারা যে একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

সূক্ষ্মদেহে এমনি যত্রতত্র বিচরণ লোকনাথের যোগ-সামর্থ্যের এক বিশেষ প্রকাশ। ভক্ত ও শিষ্যদের কল্যাণের জন্য—কখনও বা তাঁদের প্রাণদানের জন্য তাঁকে বহুবারই এই অলৌকিক শক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। ব্রহ্মচারী বাবার শিষ্য এবং জীবনীকার ব্রহ্মানন্দ ভারতী এর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন "বাবা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, তখনও তিনি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। দেহ দেয়ালটিতে ঠেস দিয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা তখন বলিত গোঁসাই মরিয়াছেন, কিছু পরেই বাঁচিয়া উঠিবেন। এইরূপ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার বিষয় তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশায় দ্বারভাঙ্গায় থাকবার সময় একবার দুঃসাধ্য উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হ'ন। ডাক্তার কবরেজ সব তাঁর প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর অন্তিম সময় এসে গেছে মনে করে শুধু ভগবানের নাম স্মরণ করতে থাকেন। শ্যামাচরণ বক্শী নামে গোস্বামী মশায়ের এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন সেখানে। তিনি এই সঙ্কটকালে দ্রুত বারদী গ্রামে এসে ব্রহ্মচারী বাবাকে ধরে বসলেন তাঁর গুরু গোস্বামীজীর প্রাণরক্ষা তাঁকে করতেই হবে। বহু অনুনয় করে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতে লাগলেন, বাবা আমার আয়ু দিয়ে আপনি গোঁসাইজীকে বাঁচিয়ে দিন।

ব্রহ্মচারী বাবা এমনিতেই গোঁসাইজীকে বড় ভালবাসতেন তার উপর শ্যামাচরণের করুণ মিনতি-ভরা কাতর ক্রন্দনে তাঁর প্রাণ গলে গেল। তিনি বললেন, বাবা, তুমি ভেবো না, দ্বারভাঙ্গায় ফিরে যাও। আমি গোঁসাইয়ের কাছে যাব। আগামী পরশু তোমরা আমায় পাবে।

ব্রহ্মচারী কিন্তু বরাবরই বারদীতে ছিলেন, অথচ এই সময় মরনোন্মুখ বিজয়কৃষ্ণের শয্যার পাশে তাঁর সুশ্রুষাকারীরা তাঁকে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। এতে বিস্ময়ের তাঁদের অন্ত থাকে না। গোস্বামীজীর জীবনীকার অমৃতলাল সেনগুপ্ত এই অলৌকিক ব্যাপারটির উল্লেখ করেছেন।

সূক্ষ্মদেহে অন্যত্র গমনের আর একটি ঘটনা।

চারিদিকে ভক্ত আর শিষ্যদের নিয়ে লোকনাথ একদিন তাঁর আশ্রমে বসে আছেন এমন সময় দেখা গেল একগাদা চিঠি নিয়ে ডাকপিওন আসছে। উপরের চিঠিখানা দূর থেকে লক্ষ্য করেই ব্রহ্মচারী বলে উঠলেন, ছাখ্ তো—ওখানা পার্বতীর চিঠি না কি? কি লিখেছে?

পার্বতী চরণ রায় বাবার এক ভক্ত, দার্জিলিং এ থাকেন, সেখানকার তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। রায়মশায় শিক্ষায় এবং আচরণে একেবারে পুরো সাহেব। এমনি সাহেব হয়েও ব্রহ্মচারী বাবার মাঝে তিনি কি দেখেছেন—তিনিই জানেন। বাবা অবশ্য নানা সময় নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন।

যাই হ'ক ব্রহ্মচারী বাবা—যে চিঠিখানা দেখে ওটা পার্বতীর চিঠি কিনা দেখতে বলেছিলেন, সেটা পার্বতীবাবুরই চিঠি। তাতে লেখা—তিনি দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু এই চিঠি লেখার আগের দিন নিজের শয্যাপার্শ্বে হঠাৎ ব্রহ্মচারী বাবাকে সশরীরে দেখতে পান। এই দেখা পাওয়ার পরেই তাঁর ঐ কঠিন রোগ সেরে যায়। বাবার কৃপাদৃষ্টি যেন তাঁর পর এমনি অব্যাহত থাকে এই তাঁর একমাত্র প্রার্থনা।

এর কয়েক দিন পর পার্বতীবাবু বাবার চরণ দর্শন করতে ছুটি নিয়ে বারদীগ্রামে এসে মহাপুরুষকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বাবা, আপনি, সত্যি করে বলুন ত—এর মাঝে কি আপনি দার্জিলিং গিয়েছিলেন?

হাসলেন লোকনাথ: আমি কি কখনও বারদী ছেড়ে আর কোথাও যাই রে?

পার্বতীবাবু শুনে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, কিন্তু আমি ত, বাবা, আপনাকে স্বপ্ন দেখিনি, পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় শোবার ঘরে স্থূলদেহে জীবন্তরূপেই ত দেখেছি।

লোকনাথ বাবা এবার সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, আমি যে তখন তোর কথাই ভাবছিলাম।

*　　*　　*

বারদীর আশ্রমে ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন বাবা, এমন সময় এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ সেখানে এসে হাজির। তাকে দেখামাত্র ব্রহ্মচারী বাবা একেবারে ক্ষেপে গিয়ে তিরস্কার এবং কটূক্তি করতে লাগলেন। যে কোন আগন্তুকের পক্ষে সে রকম গালাগালি সহ্য করা শক্ত। লোকটি শেষে ক্ষুণ্ণ মনে আশ্রম থেকে বিদায় নিলেন।

যারা এ সময়ে আশ্রমে উপস্থিত ছিল তাদের সবার মনই এতে ব্যথিত ও চঞ্চল হয়ে উঠল: সময় সময় বাবার কি অদ্ভুত খেয়াল, নিষ্ঠুর ব্যবহার।

তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে লোকনাথ বাবা অমনি বলে উঠলেন, তোরা মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছিস না? জানিস ওকে কেন এমন করে বকলাম? ওর এক বিবাহ-যোগ্য কন্যা আছে। কোন বরপক্ষ থেকে বেশি টাকা নেওয়া যাবে সেই দিকেই ওর ঝোক, এতে মেয়ে সুপাত্রে না কুপাত্রে পড়তে যাচ্ছে সে কথা একবারও ও ভেবে দেখে না। কার হাতে মেয়ে দিলে টাকার অঙ্ক সবচেয়ে বেশি বাড়বে তাই জানতে ও আমার কাছে এসেছিল।

কৌতূহলী কয়েকজন লোক তখনই ছুটে গিয়ে ব্রাহ্মণকে ধরলে তার কাছ থেকে যা জানা গেল তাতে দেখা গেল বাবার উক্তি সর্বৈব সত্য। একাধিক বরপক্ষ থেকে পনের দাবী তিনি আটশো টাকায় উঠিয়েছেন, আরও উঠানো যাবে কি না তাই জানতে তিনি বারদীতে এসেছিলেন। তিরস্কৃত ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হয়ে এ কথা স্বীকার

করেন। লোকনাথ বাবার তিরস্কারে মেয়ের কল্যাণের দিকে তাঁর দৃষ্টি না ফিরে পারে নি।

* * *

শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরির এক শিষ্য এসেছেন সেবার বারদীতে, নাম গৌর গোপাল রায়। পুলিশের এক কর্মচারী ইনি, কোন কার্য উপলক্ষ্যে ঐ অঞ্চলে এসেছেন। বারদীর আশ্রমে এসে বাবাকে প্রণাম করে সবে তাঁর সামনে বসেছেন এমন সময় একটি স্ত্রীলোক একবাটি ঘন দুধ নিয়ে সেখানে হাজির হ'ল। লোকনাথ দুধের বাটি হাতে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে উচ্চঃস্বরে—আয় আয় বলে কাকে যেন ডাকতে লাগলেন।

গৌরবাবু প্রথমে বুঝতে পারেন নি ব্রহ্মচারী বাবা কাকে এমন আদর করে ডাকলেন। ঐ ডাক শোনার একটু পরেই তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন কোত্থেকে প্রকাণ্ড এক বিষধর সাপ বাবার একেবারে কোলের কাছে এসে হাজির হ'ল। বাবা পরম স্নেহে এক হাতে তার ফণা ধরে অপর হাতে দুধের বাটিতে চুমুক দেওয়াতে লাগলেন। পান শেষ হয়ে যাবার পর বলে উঠলেন, এবার তুমি যাও।

সাপটি পোষমানা জীবের মত তখনই সেখান থেকে চলে গেল। গৌরবাবু এ দেখে আশ্চর্য হ'লেও ভয় পান নি, কারণ বাবার অসাধারণ যোগৈশ্বর্যের কথা তিনি এর আগেই শুনেছিলেন। কিন্তু বাবা যখন ঐ বাটি থেকে কিছু দুধ সর কিছু প্রসাদ পেতে বললেন, তখন তাঁর বড় ভয় করতে লাগল। মহাপুরুষ তাঁর মনের অবস্থা বুঝে হেসে বলে উঠলেন, ওরে, নে, নে, কোন ভয় নেই।

গৌরবাবু বাবার কথা অমান্য করতে পারেন নি।

* * *

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মিলনটাও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বাবা লোকনাথ তাঁর আশ্রমে কামিনী নাগ এবং আরও কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে বসে আছেন, হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন। ওরে কামিনী, বিজয় আসছে।

ভক্তেরা সব এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই। সবাই বললে, কোন দিক দিয়ে, দেখছ না ত আমরা।

লোকনাথ বাবা এ কথার জবাব দেবার আগেই বিজয়কৃষ্ণ সেখানে এসে হাজির হলেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক। এই কাজের জন্য প্রায়ই আসতে হয় তাঁর পূর্ববঙ্গে। ব্রাহ্মমতের নিরাকার উপাসনায় পুরো মন ভরে নি তাঁর, তাই শক্তিমান কোন সিদ্ধসাধকের কথা কানে গেলেই তাঁর সঙ্গলাভের অভিলাষী হয় তাঁর মন। সিদ্ধপুরুষ লোকনাথের নাম বহু আগেই শুনেছিলেন, তাঁকে দেখবার আকাংখা ক্রমেই প্রবল হয়েছে তাই, এবার পূর্ববঙ্গে এসে অন্য কাজ ফেলে আগেই ছুটে এলেন বারদীতে। এদিকে সিদ্ধ মহাপুরুষেরাও সব সময়ই এমন সব ভক্ত শিষ্যের খোঁজে থাকেন যাদের চিত্ত আধ্যাত্মিক ভাবধারা বহন করবার উপযুক্ত আধার।

প্রথমে দেখা হ'লে দুইজনেই নীরবে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন। এরপর হঠাৎ সিদ্ধযোগী লোকনাথের দু'চোখ থেকে এক অপার্থিব তীব্র জ্যোতি ঠিকরে বিজয়কৃষ্ণের চোখের মধ্য দিয়ে তাঁর দেহে প্রবেশ করল, এই সময় লোকনাথ তাঁর দীর্ঘ হাতটি বাড়িয়ে দিলেন বিজয়কৃষ্ণের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি লুটিয়ে পড়লেন লোকনাথের পায়ের উপর। লোকনাথও অমনি দু-হাত দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারের বিদ্যুৎপ্রবাহ বইছে তখন লোকনাথের দেহে, সে শক্তির প্রভাবে বিজয়কৃষ্ণ কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। বাবার একজন ভক্ত এসে তাকে ধরলো। বিজয়কৃষ্ণ বুঝলেন এক বহু আকাংক্ষিত আধ্যাত্ম সম্পদ লাভ হ'ল আজ তাঁর।

একটু সামলে নেবার পর ভক্তিবিগলিত অভিমানক্ষুণ্ণ স্বরে তিনি লোকনাথকে বললেন, এই দয়া আপনি এতদিন করেন নি কেন আমায়?

লোকনাথও অমনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তুইও তো পাষাণ, কই, একটি বারের জন্যও ত এখানে আসিস নি!

স্নেহভক্তির ভিতর দিয়ে এমনি করে এক দিব্যমধুর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল দুইজনের মধ্যে। এরপর হঠাৎ এক সময় লোকনাথ বলে উঠলেন, আচ্ছা, বিজয়, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে থাকবার সময় একদিন তুই ভীষণ দাবানলের কবলে পড়েছিলি, মনে আছে তোর?

শুনে চমকে উঠলেন বিজয়কৃষ্ণ, চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ভয়ংকর দিনটির স্মৃতি। সেই দাবানল থেকে রক্ষা পাবার কথা নয় কোন মানুষের। যে মহাপুরুষ তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে তাঁকে সে ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তিনিই এই লোকনাথ ব্রহ্মচারী। বাবার চেহারার দিকে ভাল করে তাকিয়ে একবার মিলিয়ে দেখলেন মনে মনে।

সদ্‌গুরু লাভের আকাংক্ষা নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভারতের তীর্থে তীর্থে, বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্বতে। এমনি করে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে এসে কিছুদিন একা অবস্থান করছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। স্নানান্তে শুদ্ধ বসন পরে চক্ষু মুদ্রিত করে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন বিজয়কৃষ্ণ, হঠাৎ ভয়ার্ত অজস্র বন্য প্রাণীর চীৎকারে ধ্যান ভেঙে গেল তাঁর। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখেন—দাবানলে চারিদিকের গাছপালা দাউ দাউ করে জ্বলছে। চারিদিকেই অগুনের লেলিহান শিখা, বেরুবার কোন পথ নেই, উপায় নেই। নিজের চেষ্টায় বাঁচবার কোন সম্ভাবনা নেই বুঝে বিজয়কৃষ্ণ তখন আবার দুই চোখ বন্ধ করে নিঃশেষে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে মনে মনে বলতে লাগলেন, ঠাকুর, এ জীবন রক্ষা করবার যদি কোন প্রয়োজন মনে করো তো রক্ষা করো।

বিজয়কৃষ্ণের মনে এইরূপ প্রার্থনা জাগতেই হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল: কোত্থেকে এক জটাজুটধারী দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী এসে হাজির হ'লেন বিজয়কৃষ্ণের সামনে, তারপর তাঁর আচ্ছন্নপ্রায়

দেহটাকে বুকে তুলে নিয়ে সেই আগুনের ভিতর দিয়েই বাইরে এনে এক নিরাপদ জায়গায় রাখলেন। বিজয়কৃষ্ণের তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থা। সংজ্ঞা ফিরে পাবার পর চোখ মেলে দেখেন সাধুটি আর সেখানে নেই। কিন্তু আশ্চর্য সন্ন্যাসী তাঁকে আগুনের ভিতর দিয়ে নিয়ে এলেও গায়ে তাঁর একটুও আগুনের আঁচ লাগে নি।

এবার লোকনাথকে দেখে বিজয়কৃষ্ণের আগের সেই সব ব্যাপারই আবার মনে পড়ল, তিনি স্পষ্ট চিনতে পারলেন দাবানল থেকে যে সাধু তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন সে সাধু আর কেউ ন'ন ইনিই।

* * *

লোকনাথ বাবার কয়েকজন ভক্ত এসেছে ঢাকা থেকে তাঁকে দর্শন করতে। গ্রীষ্মকাল। এসেছে সকালে, কিন্তু একথা ওকথা বলতে দুপুর হয়ে গেল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য চারিদিকে যেন অগ্নিবর্ষণ করছে, অথচ তখনই তাদের ফিরতে হবে। ভাবতে লাগল তারা এমন রোদে কি করে যে···

লোকনাথ তাদের মনের কথা জানতে পেরে বলে উঠলেন, বেরিয়ে পড় তোরা, রোদের জন্য ভাবতে হ'বে না।

ভক্তেরা বাবার কথা শুনে আর কোন ইতস্ততঃ না করে তখনই বেরিয়ে পড়ল। আশ্রমের সীমানা পার হতেই দেখে চারিদিকে যদিও রোদ তবু তাদের মাথার উপর একখানা কালো মেঘ ছায়া বিস্তার করে চলেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। বুঝল তারা এ বাবারই কাজ।

তখনই ফিরে এল তারা বাবার আশ্রমে, এসে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, বাবা, এ মেঘ কতদূর পর্যন্ত আমাদের ছায়া দেবে?

বাবা বললেন, তোমরা দয়াগঞ্জে পৌঁছলেই এ মেঘ তোমাদের মাথার উপর থেকে সরে যাবে।

সত্যিই তাই হ'ল, ঢাকার কাছাকাছি দয়াগঞ্জে পৌঁছলেই তাদের মাথার উপরকার সেই মেঘটা যেন কোথায় উড়ে গেল।

*   *   *

কুমিল্লার আদালত থেকে চাঞ্চল্যকর এক খুনের মামলার রায় বের হয়েছে। আসমী নিবারণ চন্দ্র রায়ের প্রাণদণ্ড হবে। তাঁকে হাজতে রাখা হয়েছে। আত্মীয়েরা আপীল করায় মামলা তখন হাইকোর্টের বিচারাধীন। আপীলের শুনানির দিন কাছাকাছি এসে গেছে, আসামীর উদ্বেগের সীমা নেই, আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের কথা ভেবে তিনি ছটফট করছেন, সঙ্গে সঙ্গে আকুল প্রার্থনা চলেছে বারদীর গোঁসাইয়ের চরণে: ঠাকুর আমায় কৃপা করো, আমায় বাঁচাও।

এই সময় একদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল : নিবারণ বাবু দেখলেন অর্গলবদ্ধ কারাগারের লৌহদ্বার ভেদ করে দীর্ঘকায় এক মহাপুরুষ সেখানে ঢুকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। প্রহরীরা তাঁকে বুঝি লক্ষ্য করে নি, দ্বারের বাইরেই তারা নিশ্চিন্ত মনে পাদচারণ করছে।

মহাপুরুষ নিবারণ বাবুর একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালে তিনি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে, প্রভু ?

আগন্তুক সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শান্ত গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, আমি আজ তোর মামলার রায় লিখিয়ে দিয়ে এলাম, তুই খালাস হয়েছিস।

শুনে আবেগে নিবারণ বাবুর একেবার বাক্‌রোধ হবার যোগাড়।

আমায় চিনলি নে ? আমি বারদীর ব্রহ্মচারী।

শুনে বন্দী এবার উন্মত্তের মত চীৎকার করে উঠলেন। প্রহরীরা ছুটে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই।

পরদিনই নিবারণ বাবুর কাছে এক টেলিগ্রাম এসে পৌছল তাঁর প্রাণদণ্ড রদ্ হয়েছে, অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়েছেন তিনি।

ব্যাপারটা যখন ঘটে লোকনাথ বাবা কিন্তু তখন আর নর দেহে নেই, কিছুকাল আগেই তিনি দেহ রক্ষা করেছেন।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী

বালানন্দজীর গুরুর নাম ব্রহ্মানন্দ মহারাজ। নর্মদা তীরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ গঙ্গোনাথজীর মন্দির। সেখানেই তাঁর আশ্রম।

একবার মহাসমারোহে আশ্রমে ভাণ্ডারা চলেছে। ভোজনপর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় কয়েক শত সাধু সেখানে এসে হাজির। আশ্রমের ভাণ্ডারী দেখে শঙ্কিত হয়ে নবাগতদের জন্য ছোট ছোট খিঁচুড়ির গোলা তৈরী করতে লাগলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এ দেখে চটে গিয়ে কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন, মুঝে মালুম হোতা হৈ, তুম বাঙ্গালীকা লেড়কা, কমতি খানেওয়ালা। কাহে অন্ন ইতনি কমতি দেতা হো? তুম পুরাপুরা দেও, তুমহারি কুছ চিন্তা নেহি।

এই বলে মহারাজ নিজের হাতেই গোলা বেঁধে দেখিয়ে দিলেন তার আকারটা কত বড় হবে। নবাগতদের পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করিয়ে দেখা গেল ভাণ্ডারে তখনও প্রচুর আহার্য মজুত রয়েছে।

*　　　*　　　*

নবদীক্ষিত বালানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বরোদার রাণী যমুনাবাঈর আমন্ত্রণে তাঁর প্রাসাদে যাচ্ছেন। পথে পরিচিত এক গ্রাম্য ভক্ত অনেক দিন পরে তাঁকে দেখে মহাখুশী। সে মহারাজকে কিছু দেবেই। গ্রামের দরিদ্র ভক্ত, কি আর সে

দিতে পারে, ব্রহ্মানন্দজীর ঝুলিটি ভরতি করে সে নিজের ক্ষেতের একগাদা শাকসব্জী দিয়ে দিল।

রাজপ্রাসাদে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে যমুনাবাঈ তাঁর ঝুলিটি দেখে সহাস্যে বলে উঠলেন, আজ আমাদের ভাগ্য খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে, বাবা মহারাজের ঝোলা একেবারে ভরতি। আমরা নিশ্চয়ই আজ অনেক ভাল ভাল জিনিস খেতে পাব।

ঠিক বলেছ, মাঈ, অনেক প্রসাদ পাবে তোমরা আজ এ ঝুলি থেকে। কে কি খেতে চাও বলো?

মহারাজ, আমাদের আজ আঙুর খেতে বড় ইচ্ছে হয়েছে, তাই বের করুন আপনার ঝোলা থেকে।

আঙুরের সময় তখন নয়, তাই যমুনাবাঈ ভেবেছিলেন দেখাই যাক না যোগীবর তাঁর অন্নপূর্ণার ঝোলা থেকে এখনি তা বের করতে পারেন কিনা।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখনই তাঁর ঝোলার মাঝে হাত দিয়ে এক থোলো আঙুর বের করে মহারাণীর সামনে ধরে বললেন, এই ছাখো মাঈ, তোমার জন্য আঙ্গুর আমি ঠিকই এনেছি।

শিষ্য বালানন্দজী সঙ্গে আসবার সময় স্বচক্ষে বেশ ভাল করেই দেখেছেন গ্রাম্য ভক্তটি গুরুদেবের ঝোলায় শাকসব্জী ছাড়া আর কিছু দেয় নি। তা ছাড়া এ ঋতুতে এখানে আঙুর পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই গুরুদেবের ঝুলি থেকে এ দুষ্প্রাপ্য ফল বেরুতে দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

* * *

বালানন্দজী একবার উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে বেরুলে কাঙরা উপত্যকায় এক শক্তিমান অন্তরীক্ষচারী সাধকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বালানন্দজীর শিষ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাক্ষাৎকারের এক বিবৃতি দিয়েছেন—

"কাঙরা উপত্যকায় ভাকসুতে যাইয়া গুরুদেব গোমতী স্বামীর

নিকট কিছুদিন অবস্থান করিতেছেন। সেখানে উভয়ে একদিন নিজ নিজ আসনে আছেন। এরূপ সময়ে এক মহাত্মা আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর এ সাধুটি বিদায় লইলেন। একটু তফাতে যাইবার পরই তিনি 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব' বলিয়া হাততালি দিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া গুরুদেব ও গোমতীস্বামী বাহিরে আসিলেন ও উক্ত সাধুটিকে দেখিতে লাগিলেন। উভয়েই দেখিলেন যে, তিনি 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, বলিতেছেন ও হাততালি দিতেছেন, অমনি তাঁহারা পা দুখানি ভূমি হইতে কিছু কিছু উপরে উঠিতেছে।

এরূপ করিতে করিতে তিনি শূন্যমার্গে খেচরগামী হইয়া এক পর্বত শিখরের দিকে উঠিতে লাগিলেন ও কিছুক্ষণ পরে তথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া গুরুদেব চমৎকৃত হইলেন ও উক্ত মহাত্মার সহিত উত্তমরূপে আলাপপরিচয় করিতে না পারায় দুঃখিত হইলেন। নিজ নিজ আসনে ফিরিয়া আসিয়া গুরুদেব গোমতী স্বামীকে ইঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী জানাইলেন যে তাঁহার সহিত ও বিশেষভাবে ইঁহার পরিচয় নাই। তবে আরও ২।১ বার ইঁহাকে নিম্নে আসিতে ও খেচরগামী হইতে দেখিয়াছেন। উপরের কোন শিখরে তিনি অবস্থান করেন। সেখানে কিভাবে অবস্থান করেন ও মধ্যে মধ্যে নিম্নপ্রদেশেই বা কেন আসেন উহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পরে এই খেচরসিদ্ধির বিষয়ে বাক্যালাপ হওয়ায় গোমতীস্বামী বলিলেন যে, এরূপ অদ্ভুত শক্তি এক যোগপ্রভাব বলে ও দ্বিতীয়তঃ দ্রব্য বলে লাভ হয়। যোগবিভূতির বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। দ্রব্য শক্তি বিষয়ে তিনি অবগত আছেন যে, পারদমিলিত একপ্রকার 'গুটকা' কোন কোন সাধু প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহা মুখে রাখিলে খেচরত্ব লাভ হয়। এই সাধুটির এ খেচরত্ব কি উপায়ে লাভ হইয়াছে জানিতে পারেন নাই।"

ভক্ত বনমালী রায়ের আগ্রহাতিশয্যে তাড়াসের রাজবাড়িতে এসেছেন প্রভু জগদ্বন্ধু। রাজ-ভবনে এক শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ আছে, সেবাইতরা তাকে বললেন জামাই বিনোদ। কবে কোন সময়ে ঠাকুর রাধাবিনোদ জমিদার বংশের এক ভক্তিমতী কুমারী মেয়েকে নিজের কান্তারূপে অঙ্গীকার করেন। সেই থেকে বিগ্রহের নাম হ'ল জামাই বিনোদ। জামাই বিনোদের আদর যত্নের পারিপাট্যও ঠিক জমিদার বাড়ির জামাইয়ের মত।

বনমালীবাবু বৈষ্ণব বংশের সন্তান, স্বভাবতঃই ভক্তিমান, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে জামাই বিনোদের সব সেবাকে তিনি সহজ বিশ্বাসে সব সময় গ্রহণ করতে পারেন না। প্রভু জগদ্বন্ধু তা বুঝে বনমালীবাবুকে এবার একটু শিক্ষা দিতে চাইলেন।

মন্দিরে রাধাবিনোদের স্নান, অর্চনা এবং ভোগ নিবেদন যথারীতি হয়ে গেছে, এবার তামুক সেবনের পালা। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী জামাই বিগ্রহের সামনে গড়গড়াও তামুক সেজে রাখা হচ্ছে দেখে প্রভু বনমালী বাবুকে ডেকে বললেন, চলুন এবার জামাই বিনোদের তামাকু সেবন দেখে আসি।

বনমালী রায় কোনদিন অবশ্য এ প্রথাটির তেমন গুরুত্ব দেন নি, এবার প্রভুর কথায় আরও কয়েকজনকে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না: আর সবার সঙ্গে তিনি বহুক্ষণ ধরে দেখতে লাগলেন গড়গড়ায় সাজা কলকে থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, শুধু তাই নয় অনবরত গড়গড় শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে এই দৃশ্য দেখে ইংরাজী শিক্ষিত বনমালী বাবুর দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন প্রভুর কৃপা বলেই মন্ত্রচৈতন্যের মত সেবাচৈতন্যও আজ স্ফুরিত হয়ে উঠেছে।

সেদিন এই অলৌকিক শক্তি প্রকাশের দ্বারা প্রভু জগদ্বন্ধু জমিদার বনমালী রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করেন।

*　　　　*　　　　*

বনমালী রায় আরও কয়েকবার প্রভুর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। তিনি তখন বৃন্দাবনে এসে শ্রীরাধাবিনোদের কুঞ্জ নামে একটা বাড়ি তৈরী করে সেখানে বাস করছিলেন।

শেঠের মন্দিরে সেদিন এক উৎসব উপলক্ষে পালা গান হচ্ছিল। বনমালী রায় সেখানে উপস্থিত। ভীষণ ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে ঘন ঘন 'জয়রাধে শ্যাম' শুনে এক যুবক হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ল। পালা গান প্রায় ভাঙার যোগাড়, সম্বিৎহারা যুবকের চিকিৎসা আর শুশ্রূষার জন্য লোকে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বনমালী রায় কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে দেখেন—ইনি প্রভু জগদ্বন্ধু, বৃন্দাবনে এসেছেন।

বনমালীবাবু তখনই একটা পালকীতে করে প্রভুকে নিজের বাড়ি শ্রীরাধাবিনোদ কুঞ্জে নিয়ে এলেন। তারপর প্রভুকে একটা নিরালা কামরায় সন্তর্পণে শুইয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন, যাতে তাঁর বিশ্রামের কোন বিঘ্ন না ঘটে। পাহারা দেবার জন্যে বাইরে কয়েকজন লোক রেখে দিলেন।

এই লোকগুলির সবাই—কি জানি কেন অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও ঘুমে একেবারে ঢলে পড়ে। এর মাঝে কখন কি করে যে প্রভু সেই বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন—তার সদুত্তর কেউই দিতে পারল না। আশ্চর্য বাইরে থেকে দরজা বন্ধ, সে ঘর থেকে তিনি বেরুলেনই বা কি করে?

*　　　　*　　　　*

কিছুদিন পরের কথা।

প্রভু তখন শ্রীকুঞ্জের ধারে একটা মাটির গোফায় বাস করছেন। কাছেই বনমালী রায়ের আবাস। রায় প্রতিদিন শ্রীকুঞ্জ পরিক্রমা করে প্রভুকে একবার দর্শন করে যান।

একদিন বনমালীবাবু এলেই প্রভু তাঁকে বললেন, দেখুন, আগামী কাল মধ্যাহ্নে এক মহাপুরুষ দেহরক্ষা করবেন। কা'ল সকাল থেকেই তাঁকে ঘিরে আপনারা সংকীর্তনের ব্যবস্থা করুন।

কই কোথায় সে মহাপুরুষ, কি তাঁর পরিচয়, কোথায় নিবাস? জিজ্ঞাসা করলেন বনমালীবাবু।

উত্তরে একটা বিশাল তেঁতুল গাছ দেখিয়ে প্রভু বললেন, এই ইনিই সেই মহাপুরুষ।

প্রভুর কথা উড়িয়ে দিতে পারলেন না বনমালীবাবু। তিনি নিজেও ভক্ত বৈষ্ণব, তাই তাঁর নিজেরও বিশ্বাস ছিল, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা দেখবার লোভে অনেক মহাপুরুষ এমন আত্মগোপন করে অবস্থান করে থাকেন।

প্রভুর নির্দেশমত ঐ বৃক্ষটিকে ঘিরে মহা আড়ম্বরে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তনের ব্যবস্থা করলেন বনমালীবাবু। পরদিন মধ্যাহ্নে কিন্তু সত্যি দেখা গেল—ঝড়বৃষ্টির নামগন্ধ নাই ভক্ত বৈষ্ণবদের নাম-কীর্তন এবং পরিক্রমার মাঝে মড়মড় করে গাছটি হঠাৎ ভেঙে পড়ল।

* * *

শ্যামদাসের অভিজ্ঞতা।

শ্যামদাস বৃন্দাবনে এক মহা বৈষ্ণব সাধক। তাঁর সঙ্গে প্রভুর সবে কিছুটা পরিচয় ঘটেছে, ঘনিষ্ঠতা তখন তেমন হয় নি। একদিন বৃন্দাবনের এক বনের ধারে শ্যামদাস মাধুকরী করতে গিয়েছেন, এমন সময় দূর থেকে হঠাৎ নজরে পড়ল একদল গাভী পরমানন্দে কি যেন লেহন করছে। কি লেহন করে ওরা? কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি, গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না: এক দীর্ঘ পুরুষ মাটিতে শুয়ে রয়েছেন, আর তারা নাক দিয়ে তাঁর দেহ সৌরভ গ্রহণ করছে আর মাঝে মাঝে

পরম স্নেহে তাঁর গা চেটে দিচ্ছে। সাধক পুরুষটি 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলতে বলতে তাদের এ স্নেহাদর উপভোগ করছেন। একেবারে কাছে যেতেই শ্যামদাস চিনলেন,—ইনি প্রভু জগদ্বন্ধু।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'লে শ্যামদাসের ভজনকুটিরে প্রভু কিছুকাল অবস্থান করেন। এই সময়কার কথা। একদিন প্রভু নিরালায় গোফার মাঝে বসে আছেন, নিকটে কেউ কোথাও নেই, এমন সময় শ্যামদাস দেখলেন তাঁর কুটির প্রাঙ্গণে টুপটাপ করে কোত্থেকে বারবার চন্দনমাখা গোছা গোছা তুলসীপাত পড়ছে।

আর একদিনের কথা।

প্রভু কুসুম সরোবরে স্নান করছেন। শ্যামদাস তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছিলেন। দেখতে না দেখতে স্নানরত প্রভু অলৌকিক ভাবে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, শ্যামদাস অবাক্ হয়ে দেখলেন তাঁর জায়গায় ছোটাছুটি করছে লীলাচঞ্চল এক বালক। আবার গোফার নিকটে আসতে না আসতে দেখা গেল সে বালকও সেখানে আর নেই, শ্যামদাসের সামনে দাঁড়িয়ে অতিদীর্ঘকায় জ্যোতির্ময় এক মহাপুরুষ।

গোফায় প্রবেশ করবার পর শ্যামদাস বেশ উৎসাহের সঙ্গে প্রভুকে বললেন, প্রভু, আজ আপনার স্বরূপ দর্শন করলাম।

প্রভু জগদ্বন্ধু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, ওকে কি স্বরূপ বলে? ও ত কিছুই নয়। এই দেহটাকে ইচ্ছামত যেমন ছোটও করা যায়, তেমনি বড়ও করা যায়।

*　　*　　*

নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গন ঘাটে প্রভু স্নান করতে নেমেছেন। সন্ধ্যাকাল। কি এক অজ্ঞাত কারণে প্রভু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। প্রভুর সঙ্গে ছিলেন নবদ্বীপ দাস বলে তাঁর এক ভক্ত। প্রভু ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁকে বলে উঠলেন, ওরে, তুই এখনই একবার বড়াল ঘাটে ছুটে যা তো। সেখানে একজন পরম বৈষ্ণব ভক্ত গঙ্গায় ডুবে

আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। নাম তাঁর বালকৃষ্ণ। তাঁকে ডেকে বলবি, এ ভাবে আত্মহত্যা করতে তাঁকে আমি নিষেধ করছি।

নবদ্বীপ দাস ছুটতে ছুটতে তখনই বড়াল ঘাটে গিয়ে হাজির হ'লেন। জ্যোৎস্নালোকে দূর থেকেই তাঁর নজরে পড়ল একটি লোক ধীরে ধীরে গঙ্গার গর্ভে নামছে। তাঁকে দেখেই নবদ্বীপ দাস জোরে চীৎকার করে বলে উঠলেন, বালকৃষ্ণ, বালকৃষ্ণ, ফিরুন, ফিরে আসুন, প্রভু আপনাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

হঠাৎ তার নাম ধরে ডেকে এ কথা বলায় আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প বালকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর তীরে উঠে আহ্বানকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে ভাই তুমি, তুমি আমার নাম জানলে কি করে? আর আমি যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি তাই বা তুমি জানলে কি করে?

নবদ্বীপ দাস বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন, আমি এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। প্রভু জগদ্বন্ধুর দাস আমি, তাঁর আদেশেই আমাকে এখানে ছুটে আসতে হয়েছে।

বালকৃষ্ণ উন্নত স্তরের সাধক, প্রভুপাদ বিষয় কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য তিনি। প্রেম সাধনায় আনন্দ ও বিষাদের জোয়ার ভাটা খেলে তার জীবনে। তারই এক ভাটার টানে আত্মসংবরণ করতে না পেরে দেহ বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। প্রভু জগদ্বন্ধু অলৌকিকভাবে তা জানতে পেরে তাঁর জীবন রক্ষা করলেন।

*　　*　　*

প্রভু বৃন্দাবনে যাবেন, হাওড়া স্টেশনে এসেছেন, সঙ্গে ভক্তপ্রবর চম্পটি ঠাকুর। চম্পটিকে টিকিট কেটে আনতে বললে তিনি পড়লেন মহা বিপদে। তিনি অকিঞ্চন বৈষ্ণব, তাঁর হাতে টাকা কোথায়? তাছাড়া সময়ও ত বেশি হাতে নেই। চম্পটি ঠাকুর ঘাবড়ে গিয়ে প্রভুকে বললেন, প্রভু এত রাত্রে টিকট কেনার টাকা কোথায় পাব?

ব্রজের পাথেয় গৌরভক্তই যোগাবে,—সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এরপর আর কোন কথা না বলে প্রভু স্টেশনে চুপ করে বসে রইলেন। চম্পটি পড়লেন মহা বিপদে। ভেবে তিনি কোন কুলকিনারা পান না এখনি টাকা তিনি কোথেকে যোগাড় করবেন, কে তাঁকে টাকা দেবে? গৌরভক্ত যোগাবে বললেন, কে সে গৌরভক্ত? প্রভু তার ঠিকানা ত কিছু দিলেন না। তবে?

যাই হ'ক চেষ্টা ত করা যা'ক এই ভেবে স্টেশন থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন। পরিচিত দু' একটি ভক্তের নিকটে গেলেন, কোন ফল হ'ল না। ফিরবার পথে বীডন স্কোয়ারের কাছে এসে সামনেই হঠাৎ এক তিলককণ্ঠিধারী যুবক তার দোকান বন্ধ করতে যাচ্ছে দেখে চম্পটি থমকে দাঁড়ালেন:

মশাই, আপনি কি গৌরভক্ত?

যুবক অপরিচিতের মুখে অপ্রত্যাশিত এ প্রশ্ন শুনে সবিনয়ে বললে, গৌরভক্তি লাভ হয়েছে কি না জানি না, তবে এ দাসকে লোকে গৌরভক্ত বলে বটে।

চম্পটি ঠাকুর তখন সব কথাই তাকে খুলে বললেন: তাঁর প্রভু জগদ্বন্ধু বৃন্দাবনে যাবার জন্যে স্টেশনে বসে আছেন। হাতে টিকিট কিনবার টাকা নেই, তাঁকে শুধু তিনি এই কথাটি বলে দিয়েছেন কোন গৌরভক্তের কাছ থেকেই তাঁর বৃন্দাবনে যাবার টিকিটের দাম মিলবে। গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে এল। টিকিটের দাম পঞ্চাশ টাকা আট আনা এখনই তাঁদের দরকার।

অপরিচিতের মুখে এই কথা শুনে দোকানী ভাবনায় পড়ল: এত টাকা তার দোকানের তহবিলে আজ কোথায়? যুবক বিষণ্ণ মনে মাথা নেড়ে জানাল, না, এত টাকা ত হবে না।

চম্পটি অমনি বলে উঠলেন, মশাই, প্রভু যার কথা বলেছেন, আপনিই যদি সেই ব্যক্তি হ'ন তাহ'লে আপনার দোকানে আজ

নিশ্চয়ই ঐ পরিমাণ টাকা আছে। আপনি শীগগির একবার গুণে দেখুন।

চম্পটির কথায় দোকানী গুণে দেখে তার তহবিলে সেদিন ঐ পরিমাণ টাকাই আছে। বিস্মিত দোকানী ভক্তিভরে প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ঐ টাকা চম্পটি ঠাকুরের হাতে দিয়ে দিল।

পাথেয় প্রদানকারী এই গৌরভক্ত দোকানীর নাম মুকুন্দ ঘোষ। পরে ইনি প্রভু জগদ্বন্ধুর অন্যতম পরিকররূপে তাঁর নাম প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন।

*　　　*　　　*

প্রভু জগদ্বন্ধু ঘুরতে ঘুরতে একবার হুগলীতে এসে হাজির হয়েছেন, সঙ্গে কেউ নেই, একা। তিনি সবসময়ই নিজের সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত করে রাখেন, এ দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় তিনি বোধ হয় কোন আসামী গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তখনই গ্রেপ্তার করে তাঁকে আটক রাখা দরকার।

কিন্তু এই আটক করা ব্যাপার নিয়ে এক গোল বাধল, আটক থাকতে প্রভুর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু থানায় বা হাজত ঘরে থাকতে তিনি নারাজ। কোন গোশালায় রাত্রিবাস করতে তাঁর আপত্তি নেই।

শহরের এক প্রান্তে হুগলীর নাজিরের এক পাকা গোশালা ছিল, নানা বিতর্কের পর প্রভুকে সেই গোশালায় তালা বন্ধ করে রাখা হ'ল, বাইরে পাহারার ব্যবস্থা। এদিকে ধৃত হবার পরই প্রভু একটি লোকের দিয়ে কলকাতায় সুরমাতা নামে তাঁর এক ভক্তের কাছে টেলিগ্রাম করেন।

পরদিন সকালে এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হুগলীর সব সরকারী কর্মচারী, নাজিরের গোশালা বাইরে ঠিক তালাবন্ধই আছে, কিন্তু ভিতরে বন্দী নেই। তিনি যে কি করে এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন সে এক মহা রহস্য।

এই ঘটনায় শহরে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। নাজিরের

গোশালা থেকে বন্দী পালিয়েছে বলে তাঁর আতঙ্কের অবধি নেই, শেষে বুঝি তাঁর চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়ে।

এদিকে সুরমাতা কয়েকজন ভক্ত সঙ্গে নিয়ে হুগলীতে এসে হাজির হ'লেন, প্রভুর প্রকৃত পরিচয় দিয়ে তাঁরা নাজিরকে বুঝালেন, যাঁকে তাঁরা আটক করেছিলেন তিনি একজন মহাশক্তিধর মহাপুরুষ। তাঁকে নিয়ে নাজির সাহেবের কোন মুস্কিলে পড়তে হবে না।

ঘটনাটি এরপর চাপা পড়ে যায়।

পরে হুগলীর এই ঘটনাটা প্রভুর কাছে উল্লেখ করা হ'লে তিনি বলেন, আমার এটা অপ্রাকৃত দেহ, এটা কোন স্থান কালের অধীন নয়।

* * *

ঢাকায় এসেছেন প্রভু জগদ্বন্ধু। ভক্ত রাম সাহার নতুন তৈরী মন্দিরে বাস করছেন।

এখানকার সিটফোর্ড হাসপাতালের ডাক্তার উষারঞ্জন মজুমদার একজন ব্রাহ্ম। প্রভুর বৈষ্ণব আচরণ সম্বন্ধে নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ কটাক্ষ করা তাঁর অভ্যাস। একদিন হঠাৎ দেখা গেল প্রভু তাঁর সারা গা খালি করে বসে আছেন, তাঁর নাকি ভয়ংকর অসুখ। এক ভক্তকে তিনি বারবার বলতে লাগলেন, কি করছিস তোরা শীগগির একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আন।

ভক্তরা তখন ছুটে গিয়ে ডক্টর উষারঞ্জনকেই ডেকে আনলেন। ডাক্তার এসে দেখেন রোগী একেবারে উলঙ্গ হয়ে বসে। রোগীকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে তিনি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বললেন, এ তোমরা আমায় কাকে দেখাতে নিয়ে এসেছ, এঁর ত হৃদ্‌স্পন্দনও নেই, নাড়ীর খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ কথা ত ঠিক সুস্থ মানুষের মতই বলছেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু তখন পীড়িতের ভান করে অসহায়ের মত বলতে লাগলেন, ডাক্তারবাবু, আমার দারুণ ব্যামো, এখনই ওষুধ দিয়ে আমায় ভাল করুন।

ভক্ত সুধেষের ইশারায় ডাক্তার তাড়াতাড়ি একটা বলকারক ওষুধের নাম লিখে বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন কিন্তু আজকের এ রোগী দেখে তাঁর বৈজ্ঞানিক মনে এক প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। তিনি বুঝলেন আমাদের এই বাস্তব জীবনের বাইরেও একটা অতিপ্রাকৃত ক্ষেত্র আছে, যার খবর এই প্রভু জগদ্বন্ধুর মত মহাপুরুষেরাই রাখেন।

উষারঞ্জনবাবু ক্রমে প্রভুর একান্ত ভক্তরূপে পরিগণিত হ'ন। বলাবাহুল্য তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটাবার জন্য প্রভুর ওদিনকার ঐ অলৌকিক লীলা।

ঠাকুর অনুকুল

নদীয়া জেলার একটি গ্রাম, নাম আমলাবাড়ি। এই গ্রামের ললিতমোহন বসু ঠাকুর অনুকূলের ভক্ত। ললিতবাবু একদিন গভীর অন্ধকার রাত্রিতে অন্য একটি গাঁ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, পথে পড়েছে এক বিশাল প্রান্তর, আশে পাশে কোন ঘর বাড়ি জনমনিষ্যি দেখবার সম্ভাবনা নেই। ভীষণ ভয় করতে লাগল ললিতবাবুর, প্রতিপদে গা ছমছম করতে লাগল। তখন আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে এক মনে তিনি তাঁর গুরু ঠাকুর অনুকূলকে স্মরণ করতে লাগলেন। একটু পরেই দেখেন তাঁর সামনে তাঁর গুরুদেব। ঠাকুর এসেই বললেন, চল, ভয় কি, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি, তোমায় তোমার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেব।

পুরো এক মাইল পথ ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আসার পর ললিতবাবু বাড়ি পৌঁছবোর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তাঁর পাশ থেকে কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। ঠাকুরের শক্তির কথা বহুদিন বহুলোকের মুখে শোনা সত্বেও ব্যাপার দেখে ললিতবাবু একেবারে বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার অনন্তনাথ রায় পরম ভক্ত, অতি নিষ্ঠাবান সাধক, অবশ্য অন্যমতের। ইস্টদর্শনের বাসনা তাঁর অতীব প্রবল। এই বাসনা তাঁর বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে এসে গেল যে ঘরে বসে সাধন-ভজনে আর তাঁর মন ভরল না, নির্জন মাঠের মাঝে এক কুঁড়ে ঘর তৈরী করে সেখানে উঠে এলেন। এখানে এক নাগাড়ে পাঁচ ছয়দিন নিজেকে আবদ্ধ রেখে স্নানাহার ত্যাগ করে কঠোর সাধনা করতেন। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে এসে আবার ঢুকতেন সেই কুঁড়েতে।

এইভাবে কিছুদিন সাধনার পরও যখন ইস্টদর্শন হ'ল না, তখন তিনি নৈরাশ্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু দড়ি কোথায়, দড়ি ত ইচ্ছা করলেই সেখানে পাওয়া যায় না, এ তো বাড়ি নয়, জনহীন মাঠের মাঝে একটা কুঁড়ে ঘর। দড়ি না পেয়ে তিনি একখানা কাপড়ই দড়ির মত করে পাকিয়ে বাঁশের খুটিতে বেঁধে গলায় ফাঁস লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একে জনহীন মাঠ তাতে কুঁড়ের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, সুতরাং কোন দিক দিয়ে আত্মহত্যায় কোন বাধা উপস্থিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া নিজের সংকল্পেও তিনি অটল: ইস্টদর্শন যখন হ'ল না তখন এ জীবন তিনি রাখবেনই না। গলায় ফাঁস দিতে যাবেন এমন সময় কুঁড়ের নড়বড়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকলেন ঠাকুর অনুকূল।

অনন্তনাথের আত্মহত্যা করা আর হ'ল না। দড়ির মত পাকানো কাপড়খানি তিনি লুকাতে চেষ্টা করলেন। তাও পারলেন না। ঠাকুর কাপড়খানা সমেতই অনন্তনাথকে সৎসঙ্গ বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁকে সত্য-নামে দীক্ষিত করলেন।

*　　*　　*

১৯২২ সালের মে মাসের কথা। মৈমনসিং-এর মুক্তাগাছা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁর ঘরে হারমোনিয়ম বাজিয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দের 'রতিসুখসারে

গতমভিসারে' গানটি গাইতে সবে সুরু করেছেন এমন সময় তিনি দেখলেন ঠাকুরের মূর্তিটির উপর যেন তাঁর পা। ঠাকুর অনুকূলের তিনি পরম ভক্ত, এমনটি ত হবার কথা নয়। গানটি থামিয়ে দেখব না কি এই ভেবে তিনি গান বন্ধ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের মূর্তিটিও অদৃশ্য হ'ল।

ভাল করে ব্যাপারটা বুঝে নেবার জন্য আবার ঐ গান সুরু করলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে আবার ঠাকুরের মূর্তি ঐ অবস্থায়। এবারও গান থামাবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির অন্তর্ধান। এ হয়ত চোখেরই ভুল মনে করে আবার ঐ গান সুরু করতে আবারও ঐ ব্যাপার ঘটল। গান বন্ধ করতেই ঠাকুর উধাও। সুরেনবাবু তখন ভাবলেন ঠাকুর তাঁর এ গানটা গাওয়া পছন্দ করছেন না, কিন্তু কেন? সুরেনবাবু তখন কাতরকণ্ঠে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বললেন, ঠাকুর, আমি ত আপনাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি!

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট শোনা গেল, হ্যাঁ, তা করো।

তা হ'লে আমার কোন পাপে এই শাস্তি?

এর কোন উত্তর মিলল না। সুরেনবাবু ভাবলেন—তিনি বিপত্নীক বলেই বুঝি ঠাকুর তাঁর এ গানটা গাওয়া পছন্দ করছেন না।

ঠাকুর তখন হিমাইতপুরে। কিছুদিন পরে সুরেনবাবু হিমাইতপুরে এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ঠাকুর, জয়দেবের গান গাওয়া কি আমার অনুচিত?

ঠাকুর বললেন, ও গান তোমার না করাই ভাল। সকলের জন্যে সব অবস্থার জন্যে ও গান নয়।

সুরেনবাবু তখন বুঝলেন তাঁকে সতর্ক করবার জন্যে, নিষেধ করবার জন্যেই ঠাকুর সেদিন তাঁর মুক্তাগাছার ঘরে ঐভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বাংলা যখন অবিভক্ত ছিল তখন কুষ্টিয়ায় কমলাপুর গাঁয়ে গিরীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস নামে ঠাকুরের এক ভক্ত ছিলেন। তিনি

পড়লেন।

একদিন তার দোতলার ঘরে দরজা বন্ধ করে ঠাকুরের দেখা পাবার জন্য চোখের জলে ভেসে আকুলভাবে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর ঠাকুর সশরীরে আবিভূত হ'লেন তাঁর সামনে। গিরীনবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে, আশীর্বাদ করে এবং সাধনভজন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়ে হঠাৎ তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

গিরীনবাবুর এক আত্মীয়াও একদিন তাঁর ঘরের মাঝে দিনের বেলায় এই রকম দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর তাঁকে সত্য নাম-গ্রহণের নির্দেশ দেন।

*　　　*　　　*

সতীশচন্দ্র গোস্বামী নামে ঠাকুরের এক পরম ভক্ত ঠাকুরকে ভক্তিভরে ভোগ নিবেদন করে দেখেছেন ঠাকুর দূর থেকে তা জানতে পেরে সশরীরে সেখানে এসে সে ভোগ গ্রহণ করেছেন। অন্য এক ভক্তকে এ কথা জানালে তিনি যখন তা দেখতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে দেখাতেও পেরেছেন। ঠাকুর ছিলেন তখন হিমাইতপুর, আর সতীশবাবু কুষ্টিয়ায়।

মা আনন্দময়ী

ঢাকার মাঠে তাঁর ভক্তদের নিয়ে বেড়াচ্ছেন আনন্দময়ী মা। পাশের রাস্তা দিয়ে একখানা গাড়ী যাচ্ছে। গাড়িখানার দিকে একবার তাকিয়েই মা তাঁর সঙ্গীদের বললেন, ডাক ত একবার ঐ গাড়িটা।

গাড়িটা কাছে এলে মা তাতে উঠে বসলেন।

কোথায় যাবেন ?—জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান।

মা হেসে বললেন, যাব তোমার বাড়িতে।

গাড়োয়ান জাতিতে মুসলমান। মা কেন তার বাড়িতে যেতে চাইছেন, বুঝলে না সে, জিজ্ঞাসাও করলে না। যা'ক পরেই বুঝা যাবে ভেবে—আরোহিণীকে সে তার বাড়িতে নিয়ে এল। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন ভক্ত।

তার বাড়ি এসে দেখা গেল সেখানে এক বৃদ্ধ রোগীর একেবারে মরণাপন্ন অবস্থা। আত্মীয়স্বজনেরা সব কান্নাকাটি সুরু করেছে।

মা ঐ বাড়িতে এসে গাড়ি থেকে নেমেই তাঁর এক ভক্তকে বললেন, কিছু মিষ্টি নিয়ে আয় ত।

মায়ের কথায় ভক্ত মিষ্টি কিনে আনলে মা তা ওখানে উপস্থিত সকলকে খেতে দিয়ে তখনই সেখান থেকে চলে এলেন। খবর পাওয়া গেল সেইদিনই মুমূর্ষু বৃদ্ধ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

*　　　*　　　*

মা সুপুরি কাটছেন। এমন সময় বারো বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে তার বাবা-মা তাঁর কাছে এলেন। মেয়েটির দারুণ পক্ষাঘাত, হাত-পা কিছুই নাড়তে পারে না। মেয়েটির বাপ-মা আনন্দময়ী মায়ের পা ধরে বললেন, মা, একে ভাল করে দিতেই হবে, নইলে কিছুতেই ছাড়ব না।

মা মেয়েটির দিকে একবার চাইলেন, তারপর কিছুটা সুপুরির টুকরো তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, নে ধর।

মেয়েটি অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে তা ধরলে। এরপর তারা বিদায় নিল।

সেই দিনই বিকাল বেলার কথা। মেয়েটি ঘরে শুয়েছিল। হঠাৎ রাস্তায় একটা গাড়ির শব্দ শুনে মেয়েটি তড়াক করে উঠে গাড়ি দেখতে বেরিয়ে গেল। তার মা-বাপ ত এ দেখে একেবারে অবাক্। যে মেয়ে একেবারে নড়তে পারত না, সে কি করে সুস্থ সবল মেয়ের মত অপরের কোন সাহায্য না নিয়ে এমনি দ্রুত বাইরে যেতে

পারল। কয়েকদিনের মাঝেই দেখা গেল—সে কঠিন রোগের চিহ্নমাত্র তার দেহে আর নেই।

*   *   *

ঢাকায় শাহবাগের এক কোণে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ফকিরের কবর আছে। অনেক মুসলমান সেখানে নামাজ পড়েন। এক মুসলমান বেগম শুনেছিলেন মা-আনন্দময়ী সকল ধর্মকেই সমান চোখে দেখেন, কথাটা সত্য কি না পরীক্ষা করতে তিনি মাকে ফকিরের ঐ কবরে নামাজ পড়তে অনুরোধ করলেন। মা সেখানে নামাজ পড়লেন। মায়ের নামাজ পড়া দেখে বেগম রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলেন। বেগম শিক্ষিতা, মুসলিম ধর্মগ্রন্থ তাঁর ভাল করে পড়া। তিনি বললেন, মায়ের নামাজের পাঠগুলি শাস্ত্র অনুযায়ী একেবারে নিখুঁত হচ্ছে।

নামাজের শেষে মা বেগমকে বললেন, এটা যে ফকিরের কবর চারপাঁচ বছর আগে মৈমনসিংহের বাজিতপুর যাবার সময় তাঁকে আমি সূক্ষ্ম শরীরে দেখেছি। ঢাকায় শাহবাগে আসবার পরও এ বাগানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে—সূক্ষ্ম শরীরে। তিনি আরব দেশের লোক ছিলেন, খুব দীর্ঘকায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল মার কথাই ঠিক,—জীবিতাবস্থায় ফকির সাহেবকে মা জীবনে দেখেন নি।

মহর্ষি মহেশযোগী

মহর্ষি মহেশযোগীর নাম শুনেছেন অনেকেই। হৃষীকেশে তাঁর আশ্রম। পাশ্চাত্যের বীটল ও হিপ্পিদের নামও অনেকেরই জানা, অনেকে তাদের দেখেছেনও এদেশে, ভারতবর্ষের প্রতি তাদের এক বিশেষ আকর্ষণ আছে কারণ এই দেশেরই মহর্ষি মহেশযোগী তাদের

গুরুর স্থান অধিকার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতই মহর্ষি ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনায় ইউরোপ ও আমেরিকার নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করতে পাশ্চাত্যে রওনা হ'ন—১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে।

মহর্ষির আন্তর্জাতিক ধ্যানসংস্থার সভাপতি ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ যিনি—নাম তাঁর চার্লস লিউট। নিউ ইয়র্কের ম্যাসিডন স্কোয়ারে এক বিরাট সভায় লিউট যেদিন মহর্ষিকে সবার কাছে পরিচিত করে দিলেন সভা ভঙ্গের পর লিউটকে মহর্ষির অন্তরঙ্গ মনে করে জেমস [illegible] নামে এক ভদ্রলোক লিউটকে বললেন, আপনি ত মহর্ষির সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছেন, আপনি তাঁর কোন অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন কি না?

লিউট বলতে চা'ন নি প্রথমে, কিন্তু জেমস্ একেবারে নাছোড়-বান্দা: এত বড় একজন ভারতীয় ঋষি, এত তাঁর নামডাক, পাশ্চাত্যে এত তাঁর ভক্ত, তাঁর কোন অলৌকিক শক্তির পরিচয় আপনি পান নি, এ কখনও হতেই পারে না।

লিউট তখন মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা, একটা ঘটনার কথা শুধু বলছি—

মহর্ষি একবার আমাকে নিয়ে বৃটিশ কলম্বিয়ার ওপারে দ্বীপে যাচ্ছিলেন, সেখানে এম্প্রেস হোটেলে তাঁর বক্তৃতা দেবার কথা। ঐ দ্বীপে যাবার একটিমাত্র জাহাজ, ছাড়েও তা একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে। জাহাজটি ধরতে না পারলে আবার কয়েক দিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

শীতকাল বরফ পড়ছে পাহাড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। হাতে সময় নেই, শহর থেকে বন্দরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমায়। মহর্ষিকে বললাম, সময় দেখছি বড্ড কম। এ জাহাজ ধরতে হ'লে একশো মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে যেতে হ'বে আমায়।

গাড়িতে ওঠেন নি তখনও মহর্ষি, এক মিনিট চোখ বন্ধ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, চলো।—বলেই গাড়িতে উঠে পড়লেন তিনি।

আমি পড়লাম মুস্কিলে, কারণ যে রাস্তা দিয়ে একশো মাইল বেগে গাড়ি ছুটাতে হ'বে দু'ধারে তার ঘন গাছের জটলা, পথও অতি সংকীর্ণ অথচ চালাতে হবে আমায় অন্তত একশো মাইল বেগে, তা ছাড়া বিপরীত দিক থেকে যদি কোন গাড়ি আসে ত কথাই নেই।

আমার দুশ্চিন্তার কথা জানালাম সব মহর্ষিকে : কি করা যায় ? মহর্ষি আবার এক মিনিট চোখ বন্ধ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, চালাও গাড়ি। উল্টো দিক থেকে কোন গাড়ি আসবে না এখন, কোন ভয় নেই তোমার।

মহর্ষির আশ্বাস-বাণীতে জোর পেলাম মনে, ঝড়ের চেয়েও বেশি বেগে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। মনে হ'তে লাগল কি যেন ভর করছে আমার হাতে, কি এক দারুণ নেশায় জ্ঞানগম্যি বলতে আমার আর কিছু নেই, নইলে ঐ সংকীর্ণ উঁচুনীচু বনপথে অত জোরে গাড়ি চালাতে পারতাম না আমি।

এমনি করে চলে বন্দরে ত কোন রকমে পৌঁছলাম, কিন্তু ফেরী-ঘাটে যেতে যে আরও পনের মিনিট সময় চাই। নিরুপায় হয়ে মহর্ষিকে বললাম, এত করেও জাহাজ ধরা দেখছি আমাদের হ'ল না, আমরা জাহাজের কাছে পৌঁছবার আগেই জাহাজ ছেড়ে দেবে।

মহর্ষি চোখ বন্ধ করে মিনিট খানেক ভেবে নিয়ে বললেন, চলো তুমি, কোন চিন্তা নেই তোমার।

আমরা জাহাজের কাছে পৌঁছলাম। আশ্চর্য, জাহাজ ছাড়ার সময় কখন পার হয়ে গেছে, অথচ জাহাজ তখনও ছাড়ে নি।

একজন খালাসী বললে, এমন ত কোন দিন হয় না। এই ক্যাপ্টেন আঠারো বছর ধরে এই জাহাজে কাজ করছে, এই আঠারো বছরের মাঝে জাহাজ ছাড়তে একদিনও এক মিনিট দেরী হয় নি তার। আজ হঠাৎ যেন কি হ'ল তার, জাহাজ ছাড়বার সময় ঐ ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে গেল।

নিজে আমি তখন ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

চার্লস্ লিউটের মহাত্মাকে গুরুরূপে পাওয়ার মাঝেও অলৌকিকত্ব

আছে। ক্যালিফোর্ণিয়ায় থাকবার সময় নিদারুণ পেটের রোগে দু'বছর ভুগে লিউট মরণাপন্ন হয়ে ওঠেন। এরপর ফ্রান্সিস্কোতে ...ার পর তাঁর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ডাক্তাররা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দেন। দেহের ওজন তখন অসম্ভব রকম কমে গেছে, রক্ত একেবারে নেই বললেই হয়। হতাশ হয়ে মৃত্যুর ক্ষণ গণতে থাকেন লিউট। আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল এই সময়।

রাত্রে শুয়ে আছেন লিউট বিছানায়। তন্দ্রা এসেছে চোখে এমন সময়, কোথাও কেউ নেই, হঠাৎ কে যেন তাঁকে বললে, মানুষের সেবায় তোমার জীবন যদি তুমি চিরদিনের মত উৎসর্গ করতে পার তা হ'লে তুমি তোমার জীবন ফিরে পাবে।

পরের দিন রাত্রে আবার এক আশ্চর্য ঘটনা: তাঁর আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে অজানা এক মূর্তি বলছে, তুমি শীগগিরই তোমার বিধিনির্দিষ্ট দীক্ষাগুরুর দেখা পাবে। মূর্তি দেখে আর তার কথা শুনে চমকে উঠলেন চার্লস। সে রাত্রে আর ঘুম এল না তাঁর চোখে। পরদিন সকালে যখন তিনি উঠলেন, তখন পৃথিবীর রঙ তাঁর কাছে বদলে গেছে, মনের আশা আর আনন্দ: এই সুন্দর পৃথিবী থেকে অকালে আর বিদায় নিতে হবে না তাঁর।

প্রতিদিন প্রতীক্ষা করে থাকেন গুরুর। কিন্তু কই সেই গুরু, কে সন্ধান দেবে তাঁর?

মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত-ভাবে সন্ধান মিলে গেল গুরুর। সকালে লিউট বসে আছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর এক বন্ধু একখানা খবরের কাগজ হাতে করে তাঁর কাছে এসে হাজির। তারপর বন্ধু কাগজে ছাপা একখানা ছবির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ইনি হচ্ছেন একজন ভারতীয় যোগী, একজন সত্যিকার সেণ্ট।

ছবি দেখেই লিউটের মনে হ'ল ইনি হচ্ছেন তার বিধিনির্দিষ্ট গুরু। কোথায় আছেন ঠিকানা নিয়ে ছুটলেন তিনি তাঁর কাছে,

দেখে কথা শুনে মুগ্ধ হ'লেন, ফলে আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর কাছে, শিষ্য হয়ে জনকল্যাণে উৎসর্গ করলেন জীবন।

বলাবাহুল্য সেই থেকে দেহ থেকে তাঁর রোগবালাইও বিদায় নিল।

মহাত্মা গুরুনাথ

মহাত্মা গুরুনাথ। যশোরের কেন্দাগ্রামের সাধু রামনাথের পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই ধর্মপ্রাণ তা ছাড়া সাধকও। মহিম বলে তাঁর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট একটি ছেলে তাঁর সহচর বন্ধু। বয়স অল্প হলেও দুইজন এক সঙ্গে জপতপ ধর্মসাধনা করেন।

একদিন তাঁরা দুজনে শুনলেন আমেরিকায় স্পিরিচুয়ালিস্ট নামে একটি ধর্মসম্প্রদায় আছে, তারা নাকি পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে। শুনে তাঁদেরও ইচ্ছা হ'ল পরলোকের আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। এর জন্য যে প্রেম, ভক্তি, সরলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণের দরকার তা দুইজনেরই ছিল, সাধনার কৌশলটিও মোটামুটি জেনে নিলেন, তারপর চলল চেষ্টা।

১৮৬৫ সাল। গুরুনাথের বয়স তখন আঠারো, মহিমের পনের। দুইজন আর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পবিত্র মনে আহ্বান চক্রে বসেছেন, এমন সময় মহিমের দেহ আশ্রয় করে এক পারলৌকিক আত্মার আবির্ভাব ঘটল। আত্মাটি আবির্ভূত হয়েই বললে, আমি হচ্ছি ঈশ্বরাদিষ্ট এক পারলৌকিক আত্মা, আমি যা বলছি তা কাগজে লিখে রাখ, এবং সেইভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে চেষ্টা কর, তা হ'লেই তোমরা সত্যধর্ম আবিষ্কার করে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করতে পারবে। ধর্মসাধনায় তোমাদের আগ্রহ থাকলে প্রতিহপ্তায়

আমরা কয়েকজন আত্মা তোমাদের চক্রে আসব, এসে ধর্মের সারতত্ত্ব তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

অমনি করে সাধন পদ্ধতির মূল কথা গুরুনাথ ঈশ্বরাদিষ্ট কয়েকজন আত্মার সাহায্যেই জেনে নেন। পার্থিব গুরুও অবশ্য তিনি করেছিলেন, কিন্তু প্রথম প্রেরণা, প্রথম শিক্ষা লাভ হয় তাঁর এই ঈশ্বরাদিষ্ট পারলৌকিক আত্মাদের কাছ থেকে। সিদ্ধি লাভের পথে এগুতে থাকলে যে সব অলৌকিক শক্তির অধিকারী হ'ন সাধক তার অনেকগুলিই লাভ করেছিলেন গুরুনাথ। এক জায়গায় বসে থেকে দূরে কি ঘটছে বলে দিতে পারতেন, অপরের মনের কথা বলে দিতে পারতেন, গত জন্মের কথা যেমন বলে দিতে পারতেন, তেমনি ভবিষ্যতেরও, ক্ষেত্র বিশেষে অপরকে প্রয়োজনমত আয়ুদান করতে পারতেন।

মহাত্মা গুরুনাথ লোকের মনের কথা বলে দিতে পারেন শুনে গৈলার বসন্তকুমার দাস একদিন তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য বললেন, বলুন ত গত রাত্রে আমি কি স্বপ্ন দেখেছি?

মহাত্মা অমনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, কা'ল স্বপ্নে তুমি তোমার বাবা মাকে দেখেছ।

শুনে অবাক হ'লেন বসন্তবাবু, তিনি সত্যি তাই দেখেছেন।

* * *

মহাত্মা তখন ফরিদপুর জেলার সাতপাড় গ্রামে অবস্থান করছেন। বরিশালের গৈলা-গ্রামনিবাসী নিবারণ দাস এসে তাঁকে বললেন, আপনি ত শুনেছি দূরের জিনিস দেখতে পান, দূরের কথা শুনতে পান। অনেক দিন বাড়ি ছাড়া আমি, আমাদের বাড়ির কে কেমন আছেন যদি একটু—

মহাত্মা নিবারণ বাবুর কথা শুনেই বুঝলেন তিনি তাঁকে পরীক্ষা করতে এসেছেন। তিনি তখন মৃদু হেসে একটু চোখ বুজে থেকেই গৈলার দাসেদের বাড়ির লোক সব কে কোথায় থেকে কি করছেন, কি বলছেন—সব একে একে বলে গেলেন। সর্বশেষে বললেন,

তুমি আজকের তারিখটা আর সময়টা আর তার সঙ্গে আমি যা যা বললাম—সে সব একটা কাগজে লিখে রাখ, পরে বাড়ি গিয়ে মিলিয়ে দেখ।

নিবারণ বাবু গেলা ফিরে গিয়ে বাড়ির লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখলেন, সব ঠিক ঠিক মিলে গেল।

* * *

মহাত্মা সূক্ষ্ম শরীরে অন্যত্র উপস্থিত হ'তে পারতেন। রাজকুমার বিদ্যারত্ন নামে তাঁর এক ভক্ত একবার চিল্কা হ্রদের ধারে এক পাহাড়ের উপর বসে একাগ্রচিত্তে মহাত্মাকে স্মরণ করতে গিয়ে দেখেন মহাত্মা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে গেলেই তিনি অন্তর্হিত হ'লেন।

মহাত্মা তখন কলকাতা অবস্থান করছিলেন।

আর একবার রাজকুমার বিদ্যারত্ন মশায় হিমালয়ে থাকবার সময় মহাত্মাকে স্মরণ করলেই মহাত্মা সূক্ষ্মশরীরে তাঁর সামনে আবির্ভূত হ'ন। এবার শুধু দেখা দেওয়া নয়—তিন ঘণ্টা ধরে তাঁকে অনেক নীতি উপদেশ দেওয়ার পর সেখান থেকে অন্তর্হিত হ'ন।

* * *

মহাত্মা গুরুনাথ কি কাজে অন্যত্র গিয়েছিলেন, বাসায় ফিরছিলেন পথে বন্ধু মহিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, তুমি কি ভাবছ আমি বলব?

বলো দেখি।

গুরুনাথ কতকগুলি ভাল ভাল খাবারের নাম করে বললেন, এই সব খেতে ইচ্ছা হয়েছে তোমার। আচ্ছা, আমি ওগুলি নিয়ে যাচ্ছি, তার আগে এক্ষুণি তুমি বাসায় ফিরে যাও, নইলে চোরে সব চুরি করে নিয়ে যাবে।

মহিমচন্দ্র তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে দেখলেন—সত্যিই চোর ঢুকেছে বাসায়, আর একটু দেরী হ'লেই সব চুরি হয়ে যেত।

* * *

মধুমতী নদীর উপর দিয়ে নৌকা করে যাচ্ছিলেন মহাত্মা, সঙ্গে তাঁর কন্যা ক্ষীরদা আর কলকাতা নিবাসী ভক্ত ত্রিগুণাচরণ মিত্র। বিকেলের দিকে হঠাৎ ঝড় উঠল, নদীতে উঠল বড় বড় ভয়ংকর ঢেউ। দেখে ভয় পেয়ে ত্রিগুণাবাবু মহাত্মাকে বললেন, আপনি ত এই ঢেউগুলিকে দমন করতে পারেন, থামিয়ে দিন না এদের।

মহাত্মা বললেন, ঢেউ নিবারণ অকর্তব্য, তবে আমি আমাদের নৌকার চারপাশের ঢেউগুলিকে দমন করছি। বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন যাদুবলে নৌকার চারপাশের ঢেউ শান্ত হয়ে গেল, নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলল নৌকাটি।

* * *

রামকুমার বিদ্যারত্ন মশায় একবার তিব্বতে গিয়ে এক লামার কাছে ধর্মোপদেশ চাইলে তিনি তাঁকে মহাত্মা গুরুনাথের কাছে যেতে বলেন।

তিনি ত কোনদিন তিব্বতে আসেন নি,—তাঁকে আপনি জানলেন কি করে?

লামা বললেন, আমরা পরস্পরকে জানি, সূক্ষ্মশরীরে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা হয়।

সোঽহং স্বামী

সোঽহং স্বামী। পূর্বনাম শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। যুবক শ্যামাকান্ত মল্লবীর, কুস্তিগির, অসাধারণ তাঁর দৈহিক শক্তি, বাঘের লড়াইয়ের খেলা দেখিয়ে বেড়ান তিনি। সুপুষ্ট বিশাল দেহ নিয়ে যখন তিনি পথ দিয়ে যান, দু'পাশের লোক তখন তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। এতে যেমন তাঁর আনন্দ হয় তেমনি মনে জাগে অহংকার।

একদিন এমনি পথ দিয়ে যেতে সামনে পথের মাঝখানে দেখেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বৃদ্ধ, জটাজুটমণ্ডিত, ক্ষীণকায়। যে পথে চলেছেন শ্যামাকান্ত—তা অতি সংকীর্ণ, মাঝখানে সন্ন্যাসী বসে থাকায় চলতে অসুবিধা। গম্ভীর গলায় সন্ন্যাসীকে পথ থেকে সরে বসতে বললেন শ্যামাকান্ত, সন্ন্যাসী তাতে কান দিলেন না। আর একবার বললেন, তাতেও না। তৃতীয়বার শ্যামাকান্ত ঐ কথা বললে, সন্ন্যাসী বললেন, কে হে তুমি ছোকরা, আমায় বারবার বিরক্ত করছ! তোমার যদি এত অসুবিধা হয় তাহ'লে তুমিই আমাকে ধরে তুলে পথ থেকে একটু পাশে সরিয়ে রেখে যাও না! দেখছ না আমি বুড়ো মানুষ, নড়তে পারি না, কতটুকু আর ভারী হ'ব আমি, সরিয়ে রেখে যাও না।

রেগে বিরক্ত হয়ে শ্যামাকান্ত বীরবিক্রমে পথ থেকে সরাতে গেলেন সন্ন্যাসীকে, কিন্তু আশ্চর্য ঐ পাকাটির মত শীর্ণকায় সন্ন্যাসীকে বারবার চেষ্টা করেও কিছুতেই মাটি থেকে তুলতে পারলেন না। সন্ন্যাসী মৃদু হেসে শ্যামাকান্তের দিকে চেয়ে বললেন, এতদিন কসরৎ করে কি করলে তুমি, আমার মত একটা রোগা বুড়োকে তুলতে পারলে না? চেহারাটা ত দেখছি দিব্বি বাগিয়েছ।

শুনে মাথা গরম হয়ে গেল শ্যামাকান্তের, নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগলেন ভিতরে। একটু পরেই ভুল ভাঙল তাঁর, মাথা ঠাণ্ডা হ'ল, বুঝলেন এ সন্ন্যাসী কোন সাধারণ মানুষ ন'ন, কোন সিদ্ধ শক্তিমান যোগিপুরুষ আত্মিক বলের কাছে দৈহিক বল কত তুচ্ছ তাঁকে তাই বুঝাতেই এমনটি করলেন। তখনই সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতরকণ্ঠে বললেন, এতদিন আমি অন্ধকারে ছিলাম আপনি কৃপা করে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করুণ, আধ্যাত্মিক সাধনায় আমায় দীক্ষা দিন।

এই গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে হ'লেন তিনি সন্ন্যাসী, নাম হ'ল তাঁর মোহহং স্বামী।